উপন্যাস সিরিজের একত্রিংশ সংখ্যা

আশীর্ব্বাদ

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম, এ।

বৈশাখ, ১৩২৯

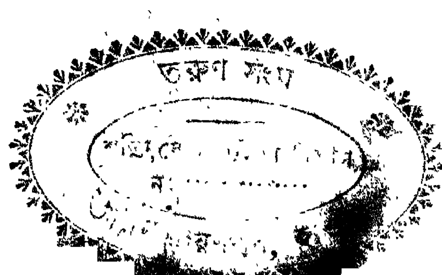
শিশির পাব্‌লিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক :—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ,
শিশির পাব্লিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট
কলিকাতা

কলিকাতা—৩৩ নং গৌরীবেড় লেন,
সূর্য্য প্রেসে
শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে





শুভা

আশীর্ব্বাদ

বর্ষাকাল, রাত্রি প্রায় ১২টা কি আরো খানিকটা বেশী হইবে, কিছুপূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কলিকাতার পথঘাট সব একেবারে কাদায় প্যাচ প্যাচ করিতেছিল।

মাণিকতলার খালের পোলের কাছে একটা অত্যন্ত সরু অন্ধকার বিশ্রী গলির মধ্যে একটা খোলার ঘরের দরজায় ঘা দিতে দিতে একটা লোক চাপা গলায় ডাকিতেছিল, "গিরী ও গিরী— দরজাটা একবার খুলে দেত!" গলিটার এক দিকে একটা প্রকাণ্ড পাটের গুদামের পশ্চাৎদিক পড়িয়াছে এবং অপর দিকে গোটা-কতক নোংরা খোলার ঘর আর মাঠকোটা, মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলার মত লো[illegible]র এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

লোকটি আবার ডাকিল, "[illegible] ও গিরী, দরজাটা একবার—" ভিতর হইতে কোন উত্তর আ[illegible]।

দরজার সমুখেই খানিকটা [illegible] জুড়িয়া বৃষ্টির জল জমিয়াছিল, লোকটার পায়ের গো[illegible] সেই কাদার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল এবং তার পরণের [illegible] এবং মলিন ধুতিটা প্রায় গোটাটাই জল এবং কাদায় একেবারে শপ শপ করিতেছিল।

আশীর্ব্বাদ

লোকটার বয়স খুব বেশী নয়—বড় জোর ৩২ কি ৩৩ হইবে। একটা জলজ্যান্ত লোককে হঠাৎ আগুনে ঝলসাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলে তার সমস্ত চেহারাখানা যেমন একটা বিভৎস আকার ধারণ করে লোকটার চেহারাখানা অনেকটা সেই ধরণের। সে একদিন কাল ছিল কি ফর্সা ছিল, তার মুখ চোখ কোনও দিন ভাল ছিল কি মন্দ ছিল এখন আর তা স্থির করিবার কোন উপায় নাই,—সবখানি জড়াইয়া সে যেন একটা অতিবড় অনাসৃষ্টি !

দরজার গায়েই একটা ভাঙ্গা রক্,—তাহার উপর অনেক উচ্চে একটা ছোট একহাত পরিমাণ আলকাতরা-মাখান ভাঙ্গা জানলা, আধখানা ভেজান, তাহারি ভিতর দিয়া বাহির হইতেছিল একটা অতিক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকরেখা এবং একটা অতিবড় কর্কশ এবং মোটা হেঁড়ে কণ্ঠের বিকৃত এবং খাপছাড়া একটা নোংরা গানের বেসুরা খানিকটা আওয়াজ আর তারি সঙ্গে একটা ফাঁসান ট্যাবটেবে বাঁয়ার বেতালা চাটির এলোমেলো একটা অলস টাম্ শব্দ।

যে লোকটা ডাকিতেছিল [illegible]য় ছিল তার হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল ছেঁড়া মলিন একটা পাঞ্জাবী ; কোন মান্ধাতার আমলের হোল-খেলার লাল লাল ছাপড়া ছাপগু[illegible] রং এখন পর্য্যন্ত তাতে লাগিয়া রহিয়াছে। মাথায় তার লম্বা লম্বা চুল—তৈলাভাবে রুক্ষ,—এলোমেলো এবং মুখময় অশৌচাবস্থার মত খোঁচা খোঁচা দাড়ি

গোঁফ তার সেই বিকৃত চেহারাখানাকে আরও বিকৃত এবং কদাকার করিয়া তুলিয়াছিল।

লোকটা পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে জোরে কপাটে ঘা দিতে দিতে ডাকিল—"গিরী ও গিরী, শুনতে পাচ্ছিস্ না?" তারপর গলাটাকে আরও জোর করিয়া লইয়া সে ডাকিল, "বাড়ীউলী ও বাড়ীউলী মাসী দরজাটা খুলে দাও না ছাই।" এইবার তবলার আওয়াজ এবং গানের বেগটা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে হাঁড়ির ভিতর হইতে একটা লোক কথা কহিলে যেমন শুনায় ঠিক তেমনি মোটা এবং বাজখাঁই কণ্ঠে কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, "মাতলামী করবার এটা জায়গা নয়—ভালয় ভালয় এই বেলা সরে পড়—নইলে বেরিয়ে জুতিয়ে লাল করে ছেড়ে দোবো বলছি।"

সে কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়া লোকটা আবার ডাকিল, "শুধু হাতে আসিনি মাসী—মাইরি বলছি—কোন শালা মিথ্যে কথা বলে—"

হঠাৎ ভিতর হইতে জড়িত স্ত্রী কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "না, আচ্ছা আপদে পড়া গেছে বাপু—ব্রাহ্মণের শোকে একে আমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিভূতো তার ওপর রাত্তিরে একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোবো তারও জো নেই।" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দরজাটা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে

একটা কালো মোটা বুড়ী অষ্টকুটি ছেঁড়া একটা খড়মড়ে শুকনো গামছা মাত্র পরিয়া হাতে একটা কেরোসিনের ডিবে লইয়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ভিতরে প্রবেশোন্মুখ লোকটাকে পথ আগলাইবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কোথায় তোর পয়সা দেখি ছোঁড়া, মনে থাকে যেন এখনও সাত সিকে বাকি রয়েছে।"

"সাত সিকে ?—কিসের সাত সিকে ? আর শনিবারে ৮ আনা দিয়ে গেছি না ?—সেটা বুঝি আর ধরতে হবে না—বারে !" বলিয়া লোকটা ভিতরে ঢুকিতেছিল, হাত আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "খবরদার পয়সা না দিয়ে মাথা গলাস্‌নে বলছি লেলো—ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো—এখানে ও সব বজ্জাতি চলবে না—বের কর্ পয়সা শিগ্‌গির বলছি।"

তার হাতটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া জোর করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া লেলো বলিয়া উঠিল, "পয়সা বুঝি রাতদিন মানুষের সঙ্গে থাকে ?—বলছি ত মাসকাবারে সব কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দোবো।" কথাটা শেষ করিয়াই সে সমুখের দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল হঠাৎ পিছন দিক্ হইতে বেগে ছুটিয়া গিয়া তার জামার একটা খুঁট খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্ রে হারামজাদা, চোখের মাথা খেয়েছিস্,—দেখছিস্ না ঘরে

লোক রয়েছে।" সে কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়া একটা হ্যাঁচকা মারিয়া জামাটাকে বৃদ্ধার বজ্রমুষ্টি হইতে অর্দ্ধ ছিন্ন অবস্থায় ছাড়াইয়া লইয়া সে সম্মুখের একটা বন্ধদ্বারে সজোরে ঘন ঘন ঘা দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভিতর হইতে অত্যন্ত মোটা এবং কর্কশ কণ্ঠে একজন হাঁকিয়া উঠিল, "জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো, খবরদার বিরক্ত করিস্ নে বলছি—উঠলে আর রক্ষে রাখবো না—খুন করে ফাঁসী যেতে হয় সোবি আচ্ছা—"

এই মোলায়েম সম্ভাষণটার উপযুক্ত কি একটা উত্তর নেলোর ঠোঁঠের ডগা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল হঠাৎ অন্ধকারে এক সঙ্গে শত সহস্র বাণের ফলার মত পিছন দিক হইতে কাহার মুহুর্মুহু শতমুখী বর্ষণে তার বাক্য রোধ হইয়া গেল। ছট্ ফট্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ষাঁড়ের মত চিৎকার করিতে করিতে সে এক লম্ফে রকের উপর হইতে উঠানে পড়িয়া দরজা পার হইয়া অন্ধকারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং চোখ কাণ বুজিয়া যেদিকে পারিল ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া লোকটা প্রথমে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া মাণিকতলার খালের পোলটার দিকে চলিতে লাগিল।

পোলের কাছবরাবর চৌমাথানির মাথায় একটা পাহারা-

ওয়ালা একটা গ্যাসপোষ্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া একটু ঝিমাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল হঠাৎ চমক্ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় হাঁকিয়া উঠিল, "কোন হ্যায় রে ?" এবং কাছে আসিয়া তার মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই কথা নাই বার্ত্তা নাই তার ঘাড়ে একটা রীতিমত জব্বর গোছের রদ্দা কসাইয়া দিয়া এবং সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া আসিয়া আবাব নিজেব ঘাটি আগলাইয়া দাঁডাইল এবং বিড বিড় করিয়া অশ্রাব্য ভাষায় লোকটার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম শুনাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। লোকটা দু' তিন বার টাল সামলাইয়া লইয়া অবশেষে কোনরূপে নিজেকে খাডা কবিয়া তুলিয়া কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং খালের পোল পার হইয়া অপর পারে পড়িয়াই সামনের একটা একতালা ছোট সুঁডির দোকানের সুমুখে আসিয়া ভিতব হইতে দরজা বন্ধ দেখিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তারপর এদিক ওদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া আস্তে আস্তে সুঁড়িখানা এবং পার্শ্বস্থ একটা সুঁদরি কাঠের লম্বা আড়তের মাঝখান দিয়া যে সরু নোংরা একটা নালার মত চলিয়া গিয়াছে, তাহারি একপাশের আধহাতটাক চাওড়া মেটে জমিটুকুর উপর পা রাখিয়া কোনরূপে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল এবং কিছুদূর আসিয়া সুঁড়িখানার পিছন দিকুকার

একটা ছোট জানলা খোলা পাইয়া ডিং মারিয়া মুখটাকে জানলার কাছবরাবর লইয়া গিয়া অত্যন্ত সাবধানে চাপা গলায় ডাকিল, "বড় বাবু, বড় বাবু একবার দরজাটা খুলে দেবেন।"

ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কে ?"

পূর্ব্বের মত চাপা গলায় উত্তর হইল—"আমি নেলো।" সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হইতে উত্তর আসিল। "খুলে দিচ্ছি, ঘুরে আয়,কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে তবে ঢুকিস্ বুঝলি !—দরজা ভেজান থাকবে, সময় বুঝে আস্তে আস্তে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়বি বুঝলি ?

"আচ্ছা"—বলিয়া লোকটা আবার পূর্ব্বের মত সেই নালাটার ধার দিয়া দিয়া অতিকষ্টে চলিয়া আসিয়া সদর রাস্তায় পড়িয়া প্রথমে একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া লইল, তারপর হঠাৎ বোঁ করিয়া সুঁড়িখানার দরজাটা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াই ঝনাৎ করিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরের ভিতর কড়িকাঠ হইতে লোহার শিকে ঝোলান একটা কেরোসিনের ল্যাম্প নিব্ নিব্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারি অস্পষ্টালোকে দেখা যাইতেছিল, দোকান জোড়া লম্বা টানা কাঠের টেবিলটার উপর একটা অত্যন্ত মোটা কালো লোক চিৎপাত হইয়া শুইয়া রহিয়াছে এবং ঘরের এককোণে মেঝের উপর আপাদ মস্তক ময়লা ছেঁড়া কাপড় মুড়ি দিয়া তিন চারটে মূর্ত্তি মড়ার মত এক পাশে ঘাড়াঘাড়ি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

লোকটা ঘরে ঢুকিতেই সেই কালো মোটা জীবটি গা মোড়া দিয়া মাথাটাকে একটু তুলিয়া তিন চারটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাই তুলিল ; তারপর হাতের উপর মাথাটাকে কোন মতে খাড়া করিয়া তুলিয়া ধরিয়া নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আজ তোর কি খবর রে নেলো ?"

একটা ভাঙ্গা পিপে ঘরের এককোণ হইতে সরাইয়া আনিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া নেলো বলিল, "এক গেলাস আগে দিতে হুকুম করে দিন দিখি বড বাবু।"

"এদিকে সবশুদ্ধ কত জমেছে সে হুঁস আছে তোর ?"

"হুঁ হুঁ খুব হুঁস আছে আমার,—কুছ পরোয়া নেই,—আপনি দিয়ে যান্ না তারপর কিছু জমে গেলে হঠাৎ একদিন সেই সেবারকার মতন একটা কিছু বুঝলেন কিনা—! ওঃ কি মস্ত দাঁওটাই সেবার মারা গেছলো বড় বাবু!—লোকটা আচ্ছা কাপড়ে-হেগো শিস্তু যাহোক্ ; আমার ত এই চেহারা, সে যদি সাহস করে একটা চড় মারতো তা হলে কোথায় যে ঘুরে পড়তুম তার ঠিক নেই ; ওঃ ভদ্দর লোক সেজে গুজে সোণার চেন বুকে ঝুলিয়ে মত্তগর্ব্বে রাস্তা দিয়ে চলেচেন,—অন্ধকারে খপ্ করে একেবারে পিছন দিক থেকে গিয়ে যাঁহাতক ঘাড়টি চেপে ধরা কি অমনি—।"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই বড়বাবু বলিয়া উঠিল,

"সে পুরোণো কাসুন্দি ঘেঁটে এখন আর লাভ কি ?—এখন আর একটা ঐরকম দাঁওটাঁও মার দেখি যে বুঝি হাঁ।"

"পারি না বুঝি মনে করেছেন বড়বাবু !—তবে কি জানেন, সব সময় অমন সুবিধে জুটে ওঠে না—সে দিন হঠাৎ বরাতটা একেবারে হাঁ হাঁ করে খুলে গেছলো, বুঝলেন কিনা,—নিন্ এখন কিন্তু এক গেলাস দিতে হুকুম করে দিন মশাই।"

"বস্ না দিচ্ছি, তুই যে একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস্ দেখছি।"

"না, না, তা না হলে কিচ্ছু ভাল লাগছে না বড়বাবু, মনটা আজ ভারি খিঁচড়ে গেছে—একটু না হলে বুঝলেন কিনা—নিন্ হুকুম করে দিন মশাই।"

"আচ্ছা দিচ্ছি" বলিয়া লোকটা হঠাৎ রাসভকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই বিন্দে একবার ওঠ্ দিকিনি—আরে এই লক্ষ্মীছাড়া, ওঠনা রে ! শালা ঘুমোচ্ছে দেখ একবার—ওঠনারে শুওর-ব্যাটা।" তথাপি যখন সেই মৃতদেহের স্তূপের ভিতর হইতে কোনরূপ সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না তখন বড়বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "যাত' লালু, শালার ঠ্যাং ধরে টেনে উঠিয়ে দিয়ে আয়ত !"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লালু সেই মড়ার গাদার ভিতর যে লোকটাকে সামনে পাইল কোনরূপ দ্বিধামাত্র না

করিয়া এবং সে প্রকৃত পক্ষে বিন্দে কিনা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া পাতুটো ধরিয়া সজোরে এক টান মারিল।

লোকটা হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া উঠিযা পড়িয়াই প্রথমটা হতভম্বের মত হইয়াগিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ঠিক করিয়া লইয়া ধাতে ফিরিযা আসিয়াই বিশ্রী একটা গাল দিয়া মুখ ভঙ্গি করিয়া লালুর ঘাড়েব উপব লাফাইয়া পড়িল এবং ফলে ঘরের মধ্যে রিতিমত একটা মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

"ভাঙ্গলেরে সব ভাঙ্গলে!" বলিয়া বিকট চিৎকার করিতে করিতে বড়বাবু উঠিয়া পড়িল, কিন্তু ছুটিয়া সেই মৃত দেহগুলোকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিবাব বন্দোবস্ত কবিবাব পূর্ব্বেই মল্লদ্বয় হঠাৎ জড়ামড়ি করিয়া তাহাদের ঘাড়েব উপর গিয়া পড়িল এবং নিমেষের মধ্যে দক্ষযজ্ঞের একটা ছোট খাট পালা রীতিমত ধুমধাম করিয়া ঘরেব মধ্যে বাধিয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয ৫ মিনিটেব বেশী এই ব্যাপার গড়াইল না, কেন না কিছুক্ষণ না যাইতেই হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে একজন অসম্ভব বকম উদার ভাব ধারণ করিয়া অতিবড় গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিল, "গান্ধীমহারাজের রাজত্বে বাস করে ভায়ে ভায়ে মারামারি করতে তোদের একটু লজ্জা হচ্ছে না?—তার পরই হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, "বল ভাই গান্ধী মহারাজ কি জয়।" সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল,

"গান্ধী মহারাজ কি জয়!" তার পরই আলিঙ্গন এবং চুম্বনের অজস্র শান্তি বর্ষণে যুদ্ধ ক্ষেত্রটা হঠাৎ করুণ একটা দৃশ্যে পরিণত হইয়া শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সকলে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে বড়বাবু প্রথমটা খুব খানিক ঝাঁই ঝাঁই করিয়া বকিতে সুরু করিয়া দিল এবং তারপর বিন্দেকে দিয়া লালুর জন্য একগ্লাস আনাইয়া লইয়া সকলকে শুইতে যাইতে বলিয়া নিজে আবার যথাস্থানে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

দক্ষযজ্ঞের ভূত প্রেতগুলি পালা সাঙ্গ করিয়া আবার সেই কোনটাতে ঘাড়াঘাড়ি করিয়া আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার মড়ার মত নিসাড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ব্বেকার সেই ভাঙ্গা পিপেটার উপর আবার আসিয়া উঠিয়া বসিয়া একনিঃশ্বাসে গ্লাসটাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া লালু বলিল, "এইবার শুইগে যাই বড়বাবু!"

এত তাড়া কিসের?—শুবি অখন—একটু গল্প করনা," বলিয়া বড়বাবু চিৎ হইয়াছিল এইবার উপুড় হইয়া শুইল এবং হাতের উপর মুণ্ডুটাকে ঠেকো দিয়ে খাড়া করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দ্যাখ লালু—এক কাজ করনা কেন—কোন ঝঞ্ঝাট নেই বেশ সহজে হবে।"

"কি কাজ বলুন না"—বলিয়া লালু নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া গোটাকতক আলিস্যি ভাঙ্গিয়া লইল।

মুখটাকে আগাইয়া আনিয়া এবং গলার স্বরটাকে কিঞ্চিৎ নামাইয়া লইয়া বড়বাবু বলিল, "তোর শ্বশুরদের অবস্থাত নেহাৎ মন্দ নয়,—তোর মাগের গায়ে কোন্ না দু'চারখানা গয়না থাকবে, ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা করে সেগুলো আদায় করে নিতে পারিস্ না কোন রকমে ?—কিচ্ছু না একবার শুধু—।"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই লালু বলিয়া উঠিল, "দোহাই তোমার বড়বাবু—ফুর্ত্তিটা মার্ডার করে দেবেন না বলছি, পাপ হবে বাবা !"

বাধা দিয়া বড়বাবু বলিল, "যা বলি আগে তাই শোন্ না—এতে কোন হাঙ্গামও নেই কিচ্ছু নেই, কিছু না কেবল একবার লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে—বুঝলি কিনা !"

"অত সাহস আমার নেই বড়বাবু।"

"একটা মেয়ে মানুষ, তাও আবার নিজের মাগ্, তার কাছে যাবি তার আবার সাহসের দরকার কিরে লক্ষীছাড়া !" বলিয়া বড়বাবু অত্যন্ত জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মুখখানাকে হঠাৎ অত্যন্ত বিকৃত করিয়া তুলিয়া লালু বলিয়া উঠিল, "হাসবেন না বড়বাবু, তাকে যদি আপনি কখন দেখতেন

তাহলে বুঝতেন যে হাঁ ভয় করে কিনা; কেন বাজে বকেন মশাই—বলছি ওসব কথা ছেড়ে দিন—মিথ্যে আমার ফুর্ত্তি মার্ডার করে দেবেন না।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বড়বাবু বলিল, “সে খুব জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ বুঝি রে?”

সে কথার কোন জবাব না দিয়া লালু ঘরের কোণে গিয়া মেঝের উপর আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

২

লালু ভট্টাচায্যের জীবনটা ছিল একটা প্রকাণ্ড অনাসৃষ্টির ইতিহাস। তার জন্মের ঠিক নদিন পরেই তার বাপের মৃত্যু হয় এবং ইহার পর ছমাস না কাটিতেই তার মাও স্বামীর অনুসরণ করে। লালুর বাপের ছিল দুই সংসার। পূর্ব্বপক্ষের ছেলেরা তখন সকলেই সাবালক হইয়া উঠিয়াছে এবং পুত্র বধূদের মধ্যে অনেকে ইতিপূর্ব্বেই দু'এক ছেলের মা হইয়া বেশ পুরাদমে সংসার চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই হতভাগ্য পিতৃমাতৃহীন জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য দুগ্ধপোষ্য শিশুটির পানে কেহই

তাকাইল না। লালুর পিতামহী তখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন হঠাৎ ৬ মাস পর পুত্রবধূর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং সংসারটার চারিদিকে মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সমস্ত শোক হঠাৎ বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া শক্ত হইয়া সেই মাতৃপিতৃহীন শীর্ণ দেহ শিশুটিকে কোলে লইয়া বসিলেন।

সকলে ভাবিয়াছিল ছেলেটা বেশীদিন বাঁচিবে না, কেন না আঁতুড় হইতেই সে মাকেও ভোগাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ভুগিতেছিল। কিন্তু সে মরিল না। ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া টালবেটাল করিয়া একটু একটু করিয়া মরিবার সমস্ত লক্ষণ কাটাইয়া এই সৃষ্টিছাড়া অনাথ শিশুটা দিন দিন বাঁচিয়া উঠিতে লাগিল এবং ঠাকুরমার আদরে এবং যত্নে বৎসর খানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া উঠিয়া দিন দিন দিব্য স্বাস্থ্যবান এবং সবল হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সে একটু একটু করিয়া বড় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সংসারের একটা দিক হইতে অত্যধিক আদর ও অন্যদিক হইতে অত্যধিক অনাদর, এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত খাপছাড়া বেতালা অবস্থার দূষিত বায়ুর চাপে তার সমস্ত শৈশবটা দিন দিন বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫ বৎসর বয়সের সময় লালুর ঠাকুর-মা লালুর হাতেখড়ি

দেওয়াইলেন এবং ভাল দিন দেখিয়া পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। খুব ছেলে বেলা হইতেই লালুর স্বভাবটার মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব দেখা যাইত। সে বাড়ীতে একদণ্ডও টিকিতে পারিত না, সমস্ত দিন রোদে রোদে টো টো করিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সন্ধ্যার পর এক গা ধূলা এবং কাদা লইয়া শুষ্ক মুখে রুক্ষ শরীরে অবসন্ন দেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। পাঠশালার গুরুমশাই প্রায়ই আসিয়া নালিস করিয়া যাইত লালু একদিনও পাঠশালে যায় না এবং গেলেও আদবেই পডাশুনা করে না। এমনি ভাবে অবিশ্রাম অভিযোগ অনুযোগের মাঝখান দিয়া লালু ক্রমে বার বৎসরের ডাগর ছেলেটি হইয়া উঠিল কিন্তু তার সেই চিরকেলে ছন্নছাড়া ভবঘুরে ভাবটার একটুও কমবেশ দেখা গেল না।

এমনিভাবে দিন যায়, লালুর ঠাকুর-মা কত করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, লক্ষ্মী দাদা আমার একটু লেখা পড়ায় মন দাও,—সে, সে কথার কোন উত্তর দেওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে করিল না।

তার বৈমাত্রেয় বড় দাদারা তার বড় একটা খোঁজ খবর রাখিত না, তবে এক এক দিন হঠাৎ এই হতভাগা ছেলেটাকে মানুষ করিয়া তুলিবার ঝোঁকটা যখন তাদের অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিত তখন আস্ত একটা কঞ্চি বা বেত এই হতভাগা ছেলেটার পিঠটার উপর বেশ সহজেই তিনি চার টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া

যাইত। ঠাকুর-মা হাঁই হাঁই করিয়া গিয়া পড়িতেন, হিতাকাঙ্ক্ষী দাদারা তখন নিরাশ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিত, "ছেলেটাকে মানুষ হতে নেহাতই যখন দেবে না তখন আর কি করি বল— এর পর কিন্তু আমাদের দোষ দিও না ঠাকুর-মা!"

তারপব হয়ত ১ মাস বাড়ী শুদ্ধ কেউ আর লালুর সহিত কথাই কহিল না এবং তারপর হঠাৎ আর একদিন বড়দাদাদের মাথায় ছোট ভাইটিকে মানুষ কবিয়া তুলিবার খেয়ালটা বেঁা করিয়া চাপিয়া যাইত এবং লালুর সর্ব্বশরীরে দাদাদের মঙ্গলেচ্ছা-গুলো দাকড়া দাকড়া হইয়া ফুলিযা উঠিত।

লালুর স্বভাবটা ছিল অদ্ভুত ধরণের ;—সে যে খুব দুরন্ত ছিল তা নয়, বরং সে চুপ চাপ করিয়া থাকিতেই ভাল বাসিত এবং তার চোখে মুখে চাঞ্চল্যের লক্ষণ একটুও দেখা যাইত না, দেখা যাইত কেবল একটা অবসাদ এবং ঔদাসিন্যের ফাঁকা ফাঁকা ভাব। পূজার সময় পাড়ার সমস্ত ছেলে মেয়েরা যখন চক্চকে ঝক্ঝকে জামা কাপড় পরিয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখিয়া দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত তখন এই হতভাগা ছেলেটা ঠাকু-মার শত কাকুতি মিনতি ঠেলিয়া একটা অতিবড় মলিন ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কোন্ দূর মাঠের মাঝখানে অন্ধকারে একলাটি মূর্ত্তিমান খেয়ালের মত কি যে করিয়া বেড়াইত তা সেই জানে। ঠাকু-মা কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন। এমনি করিয়া মাঠে মাঠে

ঘুরিয়া বেড়াইয়া এই সৃষ্টিছাড়া ছেলেটা যেচো হাওয়ার অনাবশ্যকতার সঙ্গে তার জীবনের আরও দুটো বৎসর অতিবড় অনাবশ্যক ভাবে ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিল। তার পরই হঠাৎ একদিন ঠাকুমার কান্না এবং বাড়ীর আর সকলের তর্জ্জন গর্জ্জনে পাড়ার লোকেরা জানিতে পারিল, লালু হঠাৎ কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে এবং ইহারও সাত দিন পর জানা গেল, প্রায় মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামের ধারে তাকে একজন ভদ্রলোক একটা ঝোপের আড়ালে জ্বরের ঝোঁকে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া খোঁজ করিয়া করিয়া কাল রাত্রে তাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে এবং তার জীবনের আশা নেই বলিলেই হয়।

লালু কিন্তু এবারও মরিল না। সৃষ্টির মধ্যে অতিবড় খাপ-ছাড়া এই জীবটা আবার একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করিয়া বসিল—সে বাঁচিয়া উঠিল, অথচ ইহারই ছমাস পূর্ব্বে তার বৈমাত্রেয় বড় দাদার বড ছেলেটি, গুরুমশায়ের ভবিষ্যৎবাণী যাহাকে জজসাহেবের উচ্চাসনে বসাইয়া দিয়াও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারে নাই, এ হেন সোনার চাঁদ ছেলে, মাত্র একদিন খানিকটা ভেদবমি করিয়া হঠাৎ বেমালুম মরিয়া পড়িল। বড় বৌ ভগবানের অবিচার দেখিয়া সত্য সত্যই গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

লালু সারিয়া উঠিল বটে কিন্তু পূর্ব্বের স্বাস্থ্য সে আর ফিরিয়া

পাইল না : তার দেহ, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া একটা ভার বোঝার মত কেবলমাত্র টিকিয়া থাকার দায়টুকু মাত্র লইয়া কোন মতে খাড়া হইয়া রহিল এবং অসুখ হইতে সারিয়া উঠিবার পর হইতে তার মনটা আরও ছন্নছাড়া এবং ফাঁকা হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত ততক্ষণই তার মনে হইত, পাঁচ ছ জোড়া চক্ষু তার দিকে অনবরত তাকাইয়া রহিয়াছে এবং সমগ্র বায়ুমণ্ডলটাকে বিষাক্ত করিয়া দিয়া তার এই বাঁচিয়া ওঠার অতিবড় বিড়ম্বনাটাকে রাত দিন সঙ্কেত করিয়া করিয়া ফিরিতেছে !

বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন একটা অতিবড় বেহায়ার মত কিছু একটা করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারি অসোয়াস্তিটা তার বুকের মাঝখানে একরাশ সঙ্কোচ এবং দ্বিধা দিন দিন জমা করিয়া তুলিতে লাগিল।

ইহারি দু'বৎসর পর হঠাৎ লালুর ঠাকুরমার মাথায় লালুকে গৃহী করিয়া তুলিবার খেয়ালটা ভূতের মত চাপিয়া বসে এবং অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া অবশেষে নিকটস্থ গ্রামের হরিশঙ্কর গাঙ্গুলীর একমাত্র কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা সুভাষিণীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ছেলেটার একটা হিল্লে হইল ভাবিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। লালু সেই সবে সতেরয় পা দিয়াছে এবং শুনা যায় গোটাকতক ছোটলোকের ছেলের সহিত মিশিয়া সে বেশ পুরাদমে গঞ্জিকা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেল বটে কিন্তু লালুর ছন্নছাড়া মনটা একটুও গৃহমুখী হইবার লক্ষণ দেখাইল না—বরং দিন দিন সে আরও বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতে লাগিল এবং তার বাড়ী ফেরার দুশ্চ্ল্যতাটা দু'এক দিন হইতে ক্রমে সপ্তাহেরও অধিক হইয়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে চলিল। লালুর শ্বশুর যখন সমস্ত ব্যাপার টের পাইলেন তখন মেয়েকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া দিলেন এবং ঠিক করিলেন জামাতাটিকে বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াইতে দিবেন না। লালুর বিবাহের পর ঠিক একটি বৎসর না কাটিতেই—তার পিতামহীর হইল স্বর্গলাভ এবং লালুর শেষ বন্ধনটি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাওয়ায় সে সেই যে কোথায় ডুব মারিল আর কেউ তার কোন খোঁজ খবর পাইল না—বা রাখিতে চাহিল না।

ইহার পর লালু তার স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর রাখিত না এবং এই অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাটি পিত্রালয়ে সধবা জীবনের সমস্ত চিহ্নই দেহে লইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া যাইতে লাগিল—যদিও স্বামীর সহিত তার দেখা তিন রাত্রের অধিক নয় এবং সে যে কোন শ্রেণীর জীব সে সম্বন্ধে তার জ্ঞানও ঐ অবধি-ই।

ইহার পর আরও পাঁচটা বৎসর কোথা দিয়া কাটিয়া গেল এবং পাঁচ পাঁচটা বসন্ত তার সেই অপরিস্ফুট দেহলতাটিকে একটু একটু করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিজেদের রূপ রস বর্ণ গন্ধ

সমস্ত দিয়া নিটোল করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া, সুন্দর করিয়া গড়িয়া জগতের সমুখে খাড়া করিয়া তুলিয়া ধরিল। ঠিক এমনিটা যখন তার অবস্থা সেই সময় হঠাৎ একদিন শীতের কোয়াশা ঢাকা এক সন্ধ্যায় সে পুকুরঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল—হঠাৎ পাশের কাল ঝোপের আড়াল হইতে একটি লোক খপ্ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া তার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত এবং কম্পিতকণ্ঠে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "ভয় নেই, চেঁচিও না—আমি লাল বেহারী, তোমার সোয়ামী" এবং তাহার নিকট হইতে কোনরূপ উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "আমাকে তোমার গলার ঐ হার ছড়াটা দিতে পার—বড্ড বিপদে পড়েছি—না হলে—"

তাহাকে কথাটা আর শেষ করিতে হইল না, মানুষের গলায় হঠাৎ একটা সাপ জড়াইয়া ধরিলে সে যেমন অতিবড় সন্ত্রস্তভাবে সেটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া তোলে ঠিক তেমনি করিয়া সুভাষিণী তার নিজের গলা হইতে সরু একছাড়া সোণার হারটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া আছড়াইয়া দূরে মাটির উপর ফেলিয়া দিল এবং তার পরই হাতের চুড়িগুলাকে অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে টানিয়া হিঁচড়িয়া খুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল,—সে সময় তার মুখে চোখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যার দিকে চাহিয়া লালুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত

সর্ব্বশরীরের রোমগুলো ঠিক সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল,—সে দৃশ্য দেখিবার মত শক্তি তার ছিল না; সে আপনাকে কোন গতিকে একবার সামলাইয়া লইয়াই ঝোপঝাড় ডিঙ্গাইয়া, কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, পড়িয়া, আছাড় খাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে দু'চক্ষু যায় ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই তার স্ত্রীর সহিত প্রথম সম্ভাষণ। তারপর হইতে সে তার স্ত্রীর ত্রিসীমানা কখন মাড়াইতে সাহস করে নাই। ইহার পর কতদিন কতরাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে নেশার ঝোঁকে স্ত্রীর কথা তার মনে পড়িয়া গিয়াছে, কত চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ কল্পনাতেও সে তাকে লইয়া একটা রাত্রেরও সহবাসের কথা ভাবিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু পারে নাই। ইহাকে লইয়া সে করিবে কি?—তার মনে হইতে লাগিল, ঐ গিরীর মত একটা কারুর সহিত যদি তার বিবাহ হইত, হয়ত তাহা হইলে কোন দিন সে সংসারী হইলেও হইতে পারিত, হয়ত তাহা হইলে সে বাড়ী ফিরিয়া যাইত, হয়ত তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ ঘর সংসারে মন দিতে পারিত,—কিন্তু ইহাকে লইয়া সে কি করিবে?—কিছু না—কিছু না, কল্পনাতেও সে ভাবিতে পারিল না, ইহার সহিত তার জীবনের কোথাও এক জায়গায়ও একটুখানি সংযোগ থাকিতে পারে। ইহার সহিত তাহার বিবাহ—সে যেন একটা ছেলে খেলা—নেহাতই সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু। ইহাকে দূর

দাঁড়াইয়া ব্যস্ত ত্রস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া এবং হাত দুটাকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ যা, তোমাকে নমস্কার করিতে ভুল হয়ে গেছে সুভাদি।"

ব্যস্তসমস্তভাবে পা'দুটাকে যথাসম্ভব গুটাইয়া লইয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "আমাকে ছুঁয়ো না দাদা, কাচা কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে—ঐখান থেকে করলেই হবে এখন," এবং ছেলেটি প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অত্যন্ত স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বেঁচে থাক ভাই—চিরজীবি হও।"

নমস্কার শেষ করিয়া আবার ছাদের উপর উপু হইয়া বসিয়া শরৎ বলিল, "এখানটাতে বেশ হাওয়া আসে ত সুভাদি! ওঃ কলকতার মেস্‌বাড়ীর ঘরগুলো যা গরম—সারারাত্তিরে একবারও চোখ বোজবার জো নেই—গা হাত পা সব একেবারে ঘামে হেজে যাবার যোগাড় হয়, তাও কি ছাই—" কথাটাকে শেষ না করিয়াই হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছাদের নীচেকার জঙ্গলটার দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "এ জায়গাটা একটু সাফসুদরো করে নিয়ে ছোট খাটো একটা ফুলবাগান করে নাও না কেন সুভাদি? ওঃ কলকাতা হলে ঐ জায়গাটুকুতে এতদিনে তিন চারটে চার পাঁচতালা বাড়ী উঠে যেতো; তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে সুভাদি, আমাদের মেসের ঠিক পাশেই একটা আধকাটা জমি পড়েছিল—তাই নিয়ে—" কথাটা আর শেষ করা হইল না, হঠাৎ

শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগটাকে অস্বাভাবিক রকম দ্রুত এবং সতেজ করিয়া তুলিয়া সে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমাদের বাড়ীতে চাঁপাফুলের গাছ আছে নাকি সুভাদি ? ওঃ কি চমৎকার গন্ধ !"

"না ও আমাদের গাছ নয়"—বলিয়া সুভা অন্য কি একটা কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সেটা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ বলিয়া উঠিল, "কবিতা লিখে বীণাপানি ক্লাব থেকে কেমন রূপোর মেডেল পেয়েছি তা ত আর দেখনি সুভাদি," এবং সুভাকে কথা কহিবার অবসর মাত্র না দিয়া হঠাৎ বুকপকেটের ভিতর হইতে লাল ফিতে বাঁধা একটা চকচকে রূপার মেডেল বাহির করিয়া ফেলিয়া বলিল, "কতবড় মেডেল দেখেছ সুভাদি— অনেক টাকা দাম হবে—নয় ?"

অন্ধকারে মেডেলটাকে হাতে করিয়া লইয়া চোখের খুব নিকটে লইয়া আসিয়া সুভা বলিল, "বাঃ দিব্যি মেডেল ত ! কবিতা লিখে এই মেডেল পেয়েছ বুঝি ?

"হুঁ" বলিয়া শরৎ একটু গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ সুভা বলিয়া উঠিল, "মাসীমার এইবার আর বৌ আনবার ভাবনা হবেনা দেখছি,—মেডেল পাওয়া ছেলে—একি আর পড়তে পায়।"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শরৎ উত্তর দিল, "ধ্যাৎ, আমি বুঝি বিয়ে করব [illegible]

"কেন দোষটা কি শরৎ ?"

অত্যন্ত মুরুব্বির মত মুখখানাকে সিঁটকাইয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "রামচন্দ্র ! ও সব ঝঞ্ঝাট কে পোয়াতে যাবে—বেশ দিব্যি— ।"

বাধা দিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "স্ত্রীলোকগুলো কি শুধু কেবল ঝঞ্ঝাট ছাড়া আর কিছুই নয় শরৎ ?" কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অতি অস্পষ্ট ব্যথার সুর অত্যন্ত মিহি হইয়া বাজিয়া উঠিয়া সন্ধ্যার সেই করুণ বাতাসে মিলাইয়া গেল ;—দূর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সুভা নীরবে বসিয়া রহিল ।

হঠাৎ কি মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত্তির হয়ে গেছে—নয় সুভাদি ?—আজ আবার মুখুয্যেদের বাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হবে—আর দেরী করব না ।"

মেডেলটাকে ফিরাইয়া দিয়া সুভা বলিল, "তুমি ত এতদিন কলকাতায় ছিলে শরৎ—ওঁদের সঙ্গে কোনদিন তোমার পথে ঘাটে দেখা হয় নি ?"

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার উপু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "লালুদার কথা বলছ ত ?—হাঁ একদিন হঠাৎ মাণিক-তলার কাছে দেখা হয়ে গেছলো—বড্ড রোগা হয়ে গেছে সুভাদি ! —আমাকে কিন্তু লালুদা খুব ভালবাসে ; আমি এত বড় হয়েছি—

তবু আমাকে ঠিক ছোট ছেলের মতন করে বুকের ভেতর টেনে নিলে।" শরৎ আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাধা দিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "আর রাত কোরো না শরৎ," এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাত তখন প্রায় নটা হইবে,—শরৎ নিজেদের বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল, "মা!"

শরতের মা দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "মুখুয্যে বাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে যাবি নে?"

"যাবো বৈকি।" বলিয়া শরৎ উঠান পার হইয়া সম্মুখের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; তার মাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "গাঙ্গুলী বাড়ী গেছলি বুঝি রে?"

জামাটা খুলিয়া আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিতে রাখিতে সে বলিল "হুঁ"।

"সুভার সঙ্গে দেখা হোলো?"

"হোলো।"

"সে কি বল্লে?"

তক্তপোষের উপর বসিয়া বাঁপায়ের জুতাটাকে হাত দিয়া টানিয়া খুলিতে খুলিতে শরৎ বলিল, "কি আর বলবে?—এমনি যা-তা কথা।"

"লালুর কথা তোকে কিছু জিজ্ঞেসা করলে না ?"

"করলে বৈকি।"

"তুই কি বল্লি ?"

"বল্লুম যে বড্ড রোগা হয়ে গেছে।"

শরতের মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে সে কি বল্লে ?"

জুতো জোড়াটাকে তক্তপোষের তলায় ঠেলিয়া দিতে দিতে শরৎ উত্তর দিল, "কিছু বল্লে না, চুপ করে রইলো।" কথাটা শেষ করিয়াই সে হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "সুভাদির ভারি কষ্ট—নয় মা ? "

"কষ্ট নয় আবার!—তার যে কি কষ্ট তা সেই জানে," বলিয়া শরতের মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "সেই সেদিনকার একরত্তি মেয়ে; এখনও মনে পড়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি উড়িয়ে মাসী-মা মাসী-মা, করে ছুটে আসত—মা-মরা মেয়ে এমনি দয়া হোতো! বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কত আদরই করতুম— ।"

ধীরে ধীরে শরৎ বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

"কিরে—শুলি যে বড়! রাত দুপুরে নেমন্তন্ন রাখতে যাবি নাকি ?"

"মাথাটা বড্ড ধরেছে মা, নেমন্তন্ন রাখা আর হলো না

দেখছি" বলিয়া শরৎ পাশবালিসটাকে বুকের ভিতর করিয়া লইয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

শরৎরা ছিল সুভাদের প্রতিবেশী এবং লালুদের সহিত তাদের খুব দূর কি একটা সম্বন্ধ ছিল শুনা যায়।

শরৎদের বাড়ীটি ছিল লালুদের এবং সুভাদের গ্রামের মাঝ-বারবর এবং সে খুব ছেলেবেলা হইতেই এই-দুটি পরিবারে মধ্যে অতিবড় পরিচিতের মত যাওয়া আসা করিত।

শরতের এই একটা মস্তবড় গুণ ছিল, সে আপন পর বুঝিত না এবং হঠাৎ যার তার সহিত খুব সহজে গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইয়া তুলিতে পারিত।

এই গায়ে-পড়া ছেলেটির বয়স যখন পাঁচ কি ছয় সেই সময় লালুর বিবাহ হয় এবং এই বিবাহের সহিত তার একটা মস্তবড় যোগাযোগ ঘটিয়া যায়,—এই বিবাহে সে সাজিয়াছিল নিতবর। তারপর বিবাহ ত কোন মতে হইয়া গেল কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই দুটি পরিবারের বৈবাহিক সূত্রটায় হঠাৎ এক জায়গায় জট ধরিয়া গিয়া গোলমাল পাকাইয়া গেল। সুভার বাপ হরিশঙ্কর, লালুর গুণাগুণের কথা কিছুই জানিতেন না, তিনি কেবল এইটুকু জানিতেন যে ছেলেটি লেখাপড়া তেমন করে না এবং অত্যন্ত উদাস প্রকৃতির। লালুর ঠাকু-মা নিজে আসিয়া হরিশঙ্করের হাত দুটা ধরিয়া এই বিবাহের প্রস্তাব করে এবং

একটা জেদাজিদির মাথায় এই বিবাহটা হইয়া যায়। লালুর ঠাকু-মা ভাবিয়াছিল, তার বড নাতীরা হযত চুপি চুপি গিয়া ভাংচি দিয়া আসিবে কিন্তু তাবা ভাংচি ত দিলই না বরং হঠাৎ অতিবড় আত্মীয়ের মত দেনা পাওনা লইয়া হরিশঙ্করের সহিত এমনি কসাকসি আরম্ভ করিয়া দিল যে সে বেচাবা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল।

বিবাহের কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন হরিশঙ্কর জানিতে পারিলেন, তাঁর গুণধর জামাইটির বেশ রীতিমত পান-দোষ আছে এবং আবও কিছুদিন পব জানা গেল, সে রাত্রে বাড়ী থাকে না। তারপরই লালুব-ঠাকুমার হইল স্বর্গলাভ এবং লালু হঠাৎ কোথায় যে ডুব মারিল তার আর কেহ কোন খোঁজ খবর রাখিল না; কেবল পাড়ার লোকের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যাইত সে কলিকাতার অমুক স্থানে, অমুক গলিতে, শুধু গায়ে শুধু পায়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

৪

রাত তখন প্রায় একটা কি আরো কিছু বেশী হইবে,—শুঁড়িখানার মেঝের উপর এক কোণে গুঁড়ি শুঁড়ি মারিয়া মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে গুঁজিয়া, লালু নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছিল—হঠাৎ একটা খুব জবর গোছের ঝাঁকুনি খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "কি যে ছেলেমানুষী করেন বড়বাবু তার ঠিক নেই, কত কষ্টে নেশাটা একটু— ।"

তাকে আর কথা কহিতে না দিয়া বড়বাবু বলিয়া উঠিল, "সাবাস ঘুম কিন্তু যাহোক তোর নেলো! আমি ভাবলুম বুঝিবা মরেই গেছিস্, যে ডাকাডাকিটা করেছি—আমার বোধ হয় মরামানুষ হলেও এতক্ষণে জ্যান্ত হয়ে উঠতো—আচ্ছা ঘুম কিন্তু যাহোক তোর বাবা।"

চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে মুখখানাকে সিঁটকাইয়া নেলো বলিল, "এমনই কি দরকারটা শুনি?"

হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বড়বাবু বলিয়া উঠিল, "দরকার না থাকলে শুধু শুধু ডেকে মরছি—নয়?—হারামজাদার কথার ছিরি দ্যাখ না একবার,—বসিয়ে বসিয়ে ব্যাটাকে মদ গেলাব, আবার ঘুম ভাঙ্গালে নবাবের কাছে তার জন্তে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এমনি নেমকহারামই দুনিয়াটা বটেরে।"

একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া লালু বলিল, "কি করতে হবে তাই সোজা করে বলুন না মশাই—এই ত সেদিন হারছড়াটা—।"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই—স্বরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া বড়বাবু বলিয়া উঠিল, "তা আর কে অস্বীকার করছে?—তবে কি জানিস্—যদি কিছু মনে না করিস্ ত একটা কথা বলি, সেই যে হারছড়াটা এনে তুই আমার হাতে দিলি সে ত আজ ছমাস হয়ে গেছে, এই ছমাসে কতটাকার মাল তোর পেটে গেছে সেটা একবার হিসেব করে দ্যাখ দেখি তুই।"

এ কথার জবাবে লালু কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া বড়বাবু আবার বলিয়া উঠিল, "মরুক্‌গে যাক্ সে সব বাজে কথা, তুই যদি নাই কিছু দিতে পারিস্ তাই বলে কি মনে করেছিস্ তোকে খেতে দেবো না, তবে কি জানিস্, নিজের ঘর থেকে টাকা বের করতে হলে একটু গায়ে লাগে—সেই জন্যেই যা,—তাই বলছিলুম কি জানিস্"—এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ বড়বাবু থামিয়া গেল।

"কি বলছিলেন বলুন না?" বলিয়া লালু আর একটা হাই তুলিল।

"তুই ত আবার এখুনি চটে উঠবি, বলবি, আমার ফুর্ত্তি মার্ডার করে দিলে—হ্যান ত্যান্ সাত সতেরো।"

একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া লালু বলিল, "যা বলবেন পষ্ট করে বলুন না মশাই, আপনার ওসব হেঁয়ালী টেঁয়ালী আমি বুঝি না।"

গলার স্বরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া বড়বাবু বলিল, "বলছিলুম কি জানিস্, এই—এই, একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দিনকতক— ।"

কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়াই লালু বলিয়া উঠিল, "ওকথা ছাড়া আর যা বলবেন শুনতে রাজি আছি বড়বাবু, কেবল ঐ কাজটি আমার দ্বারা হবে না—মাপ করবেন মশাই।"

একটু বিরক্ত হইয়া বড়বাবু বলিল, "কথাটা শেষ করতেই দেনা ছাই, আগে থাকতে হাঁকপাঁক করে মরিস্ কেন?—আমি বলছিলুম কি, দিনকতক শ্বশুরবাড়ী গিয়ে— ;"

"কেন বাজে বকেন মশাই, আপনি ত বেশ দিব্যি সহজে বলে দিলেন—তারপর আমি শালা মরি আর কি!"

"এর ভেতর আবার মরবার ভয় কোত্থেকে এল রে আহাম্মক? যাবি ত নিজের শ্বশুরবাড়ী—তাও আবার— ।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুখে বলতে সবাই পারে,"—কথাটা শেষ করিয়াই হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বলিল, "তার চেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখিগে, কোথাও যদি কিছু স্থবিধে টুবিধে করে উঠতে পারি।"

"তবে মরগে যা!—যা খুশী হয় করগে, সোজা উপায় বাতলে দিলুম তাতে বাবুর হোলো না—আমার কি? মরতে নিজেই

মরবি ; শ্রীঘর বাস কপালে যখন রয়েছে তখন খণ্ডাবে কে ?—মরগে যা।”

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া নেলো বলিল, “আপনার পয়সা নিয়ে বিষয়—তা সে যেমন করেই আসুক না কেন তাতে আপনার দরকার কি মশাই ?—নিন্ দরজাটা বন্ধ করে দিন্।”

রাস্তায় পড়িয়া লালু কথাবার্ত্তা নাই সটান্ দক্ষিণ মুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তারপর হঠাৎ একটা অত্যন্ত সরু বন্ধ গলির মুখের কাছে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বোঁ করিয়া তাব ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

গলিটা অত্যন্ত সরু এবং অন্ধকার ;—গলীর দোতলা তেতালা বাড়ীগুলো সব নীরব নিস্তব্ধ, লালু গলির এমোড় হইতে ওমোড পর্য্যন্ত দু'তিনবার পাচারি করিয়া বেড়াইল, তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া একটা একতালা ভাঙ্গাবাড়ীর সুমুখে আসিয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। বাড়ীটা একে একতালা, তার উপর তোলাটাও অত্যন্ত নীচু। লালু একবার মুখ তুলিয়া ছাদের অবস্থাটা দেখিয়া লইল। ছাদের এক কোণে, রাস্তার দিকে একটা ট্যাঙ্ক বসান রহিয়াছে এবং তাহারি গা দিয়া একটা পাইপ বরাবর রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া আসিয়াছে। নেলো সেই পাইপটাকে ধরিয়া অল্প একটু টান মারিয়া দেখিল কোনরূপ শব্দ হয় কি না ;—না

একটুও শব্দ হয় না ! পাইপটা মোটেই আল্‌গা নয় ; সে তখন কাপড়টাকে উরুতে পর্য্যন্ত তুলিয়া বেশ আঁট করিয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া লইল, এবং তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে বাড়ীটার ভাঙ্গা ইট্‌ বারকরা দেয়াল বাহিয়া নলটার উপর ভর দিয়া ছাদের উপর আসিয়া পড়িয়া প্রথমেই একবার গলির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাবধানে চারিদিক দেখিয়া লইল—কেউ তাকে লক্ষ্য করিয়াছে কিনা, তারপর আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ির দরজাটার কাছে আসিয়া অত্যন্ত সাবধানে টানিয়া দেখিল, সেটা খোলা আছে কিনা ?—না সেটা খোলা নাই, ভিতর দিক হইতে বন্ধ। সে পা টিপিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল এবং তারপর ভিতরের উঠানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল, ছাদ হইতে উঠানে নামিয়া পড়িবার কোনরূপ সহজ উপায় আছে কিনা। ছাদ হইতে উঠানটা বড় বেশী নীচু নয়—বড় জোর আট নয় হাত হইবে, সে অনায়াসে এইটুকু লাফাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু লাফাইয়া পড়িবার সময় পায়ের শব্দ হয় যদি, তাহা হইলেই যে সর্ব্বনাশ !

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে সে স্থির করিল, ছাদের কার্ণিসটাকে ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে একসময় হাত দুটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আল্‌তো লাফাইয়া পড়িবে,—তাহাতে বিশেষ শব্দ হইবার সম্ভাবনা নাই ; আর,

একটু আধটু শব্দ হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না ; এত রাত্রে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়ই ! আর, তা'ছাড়া উপায়ই বা কি ?

সে শরীরটাকে যতদূর সম্ভব আল্‌গা করিয়া দুই হাতে কার্ণিসটাকে বেশ শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে উঠানের দিকে ঝুলিয়া পড়িল এবং তলার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া হঠাৎ এক সময় হাত দুটাকে ছাড়িয়া দিল।

যেখানে গিয়া তার পা দুটা পড়িল সেখানটা ভয়ানক পিচ্ছিল ; বাড়ীর যত লোক দুবেলা সেইখানে আঁচাইত এবং তাহারি ফলে সেখানটাতে বেশ পুরু হইয়া একপ্রস্ত সেওলা জমিয়া গিয়াছিল ; অন্ধকারে লালু এটা লক্ষ্য করিতে পারে নাই ; হাত দুটা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে উঠানে পড়িয়াই পা পিছলাইয়া, টাল সামলাইতে না পারিয়া একেবারে সটান্ মেঝের উপর শুইয়া পড়িল ; পাশেই বসান ছিল একটা খালি বালতি, সেটা ঝন্ ঝন্ শব্দে উল্টাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই উঠানের পাশের একটা ঘর হইতে কে একজন ব্যস্তসমস্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অরুণ, অরুণ, আলোটা জেলে একবার বেরিয়ে পড়ত হে !"

ক্ষীপ্র গতিতে উঠিয়া পড়িয়া লালু পাশেই সিঁড়ির তলাকার একটা কয়লা রাখিবার ছোট্ট অন্ধকার চিলকুঠুরীর মধ্যে ঢোকা করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

নিমেষের মধ্যেই সমস্ত বাড়ীটা সজাগ হইয়া উঠিল, কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে ছাতা, কাহারও হাতে লণ্ঠন, সকলেই শশব্যস্ত—খোঁজ খোঁজ কোথায় গেল! একজন বলিল,—"না—না—ও কিছু না, বেড়াল হবে বোধ হয়।" আর একজন বলিয়া উঠিল, "কখনই না, আমি দরজা খোলবার সময় নিজের চোখে দেখেছি,—অন্ধকারে কে যেন বোঁ করে সরে গেল।"

লোকজনের গোলমাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, লালুর বুকখানার ভিতর একেবারে ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। হঠাৎ একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "সব জায়গা দেখা হলো—এইবার একবার কয়লার ঘরটা—"

লালুর বুকটার উপর কে যেন সজোরে একটা হাতুড়ি বসাইয়া দিল। তার পরেই সে কি ভীষণ চীৎকার! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় উঠানের উপর আনিয়া ফেলা হইল, তারপরই চারিদিক হইতে লাথি, কিল, চড়, ঘুসী—সে কি বীভৎস কাণ্ড! লালুর পাঁজরাগুলো পর্য্যন্ত যেন ধসিয়া ধসিয়া বুকের ভিতর বসিয়া যাইতে লাগিল—ওঃ কি ভীষণ সে প্রহার।

লালুর সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতেছিল—বিশ্ব দুনিয়াটা তার চোখের সামনে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ সেই অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায়, সেই ভীষণ, বীভৎস, কর্কশ, পৈশাচিক

চেঁচামেচির খাপছাড়া গোলমাল ভেদ করিয়া আর্ত্তনাদের মত একটি অত্যন্ত ক্ষীণ করুণ কম্পিত নারীকণ্ঠ তার কানে আসিয়া পৌঁছিল, "ও দাদা ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আর মেরো না—মরে যাবে, মরে যাবে।"

অতি কষ্টে লালু একবার চোখ চাহিল, তার মাথা ঘুরিতে-ছিল, স্বপ্নের মত আবছা সে দেখিতে পাইল, নিষ্ঠুর লোকগুলোর সেই ভিড়ের ভিতর আলুথালু বেশে দাঁড়াইয়া কুড়ি একুশ বৎসর বয়সের একটি তরুণী মেয়ে, কোলে তার একটি কচি শিশু ভয়ে মার বুকে মাথা লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে ;—অপলক নয়নে সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ এই সময় কে একজন তার গালে সজোরে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া অত্যন্ত কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওদিকে ভদ্দর লোকের মেয়ের দিকে চেয়ে কি দেখছিস্‌রে শালা!" লালুর মাথাটা বোঁ করিয়া একবার ঘুরিয়া গেল—তার পরেই জগৎ অন্ধকার।—কেবল অত্যন্ত অস্পষ্ট ক্ষীণ কান্নার মত কার গলার স্বর একবার যেন তার কানে গেল—"তোমাদের পায়ে পড়ি দাদা, আর মেরো না!"

কতক্ষণ সে এইভাবে অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল তা সে নিজেই টের পায় নাই, হঠাৎ এক সময় চোখ মেলিয়া দেখে, সে সেই একতালা বাড়ীটার দরজার সামনে অন্ধকারে ধূলার

উপর রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই।

সজাগ হইয়া উঠিয়াই লালু একবার হঠাৎ সেই বাড়ীটার পানে চাহিল, তার মনে হইতে লাগিল বাড়ীর ভিতর হইতে কার যেন করুণ একটি ক্ষীণ স্বর অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে তখন পর্য্যন্ত বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে,—"মেরো নাগো, মেরো না।" সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তারপর অতিকষ্টে দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া বসিল; ওঃ সর্ব্বাঙ্গে কি ভয়ানক ব্যথা!— কে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে সারারাত ধরিয়া হাতুড়ি পিটিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর আস্তে আস্তে পা ঘস্‌ড়াইয়া ঘস্‌ড়াইয়া একটু একটু করিয়া গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অত্যন্ত অলস এবং লক্ষ্যহীনভাবে খালের ধারে আসিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস তার গায়ে আসিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া লাগিতেছিল এবং অদূরস্থ একটা গাছের উপর গোটাকতক পাখী কিচমিচ করিয়া জাগিয়া উঠিয়া পাখা ঝাপটা দিতেছিল। পৃথিবীটাকে লালুর আজ বেশ ভাল লাগিতেছিল, আজ কেন কে জানে, তার মনে হইতেছিল, দুনিয়াটার বুকে তার কোথাও

এককায়গায় যেন একটা নাড়ীর টান আছে—সে শুধু কেবল বেখাপ্পা ভাসিয়া যাইতেই আসে নাই।

৫

সকাল বেলা স্নভা রান্নাঘরে বসিয়া কুটনা ছাড়াইতে ছাড়াইতে রন্ধননিরতা বড ভাজের সহিত গল্প করিতেছিল, এমন সময় দরজার নিকট চটি জোড়াটাকে ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া হরিশঙ্কর ডাকিল—"স্নভা ?"

"কেন বাবা ?"

"বিমলকে তোর মনে পড়ে ?"—বলিয়া হরিশঙ্কর মেঝের উপর উপু হইয়া বসিতে যাইতেছিলেন, স্নভা তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ হইতে একটা পিঁড়ে আনিয়া দিল এবং তারপর বঁটিটাকে আবার কোলের সামনে লইয়া বসিয়া বলিল, "বিনোদ মাসীমার ছেলে ত ? খুব মনে পড়ে, সে ডেপুটি না ঐ রকম কি একটা হয়েছে না ?"

নস্যের ঠোঙা হইতে এক টিপ নস্য লইয়া নাকে গুঁজিয়া হরিশঙ্কর বলিল, "হাঁ সে ডেপুটিগিরি পেয়েছিল বটে—কিন্তু শুনছি ছেড়ে দিয়েছে।"

"কেন বাবা ?" বলিয়া স্বভা বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"সে যে গান্ধীর শিষ্য মা।"

"ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে দিন খবরের কাগজে পড়ছিলুম বটে, বড় বড় লোক সব চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—সেই যে বৌদিদি !—হ্যাঁ বাবা, ও রকম করছে কেন ওরা ?"

"আমি নিজেই মা ওসব খুব বেশী বুঝি না, দু একদিনের মধ্যেই বিমল আসছে ত, তার মুখে শুনলেই জিনিষটা ঠিক বুঝতে পারবে, কেননা সে, জিনিষটাকে আমাদের মতন শুধু কেবল যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেনি—দরদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে," বলিয়া হরিশঙ্কর আর এক টিপ নস্য নাকের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন।

একটা আস্ত আলুকে চার টুকরা করিতে করিতে স্বভা বলিল, "তা, এখানে আসছে কেন বাবা ?"

"ওদের ওপর ভার পড়েছে, দুচারজন যুবক মিলে এক একটা গ্রামে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মত প্রচার করতে থাকবে, আর ঘরে ঘরে যাতে চরকা আর খদ্দরের প্রচলন হয়, তারি চেষ্টা করবে !"

কুটনা কোটা শেষ করিয়া বঁটিটাকে কাত করিয়া রাখিয়া স্বভা বলিল, "বেশ মজা হয়েছে ত, বিমলদার বরাতে নিজের

গ্রামটাই পড়ে গেছে—তাকে বেশী খাটতে হবে না, নয় বাবা?—সবই জানা শোনা!"

একটু হাসিয়া হরিশঙ্কর বলিলেন, "বরাতে কি আর পড়ে গেছে রে পাগলী, সে নিজেই সুবিধের জন্যে এ গ্রামের ভার নিয়েছে।—যাক্, আসল কথাটাই হোলো না—সে যে আসছে তাকে থাকতে দিবি কোন্ ঘরে?"

"কেন, দাদা যতদিন না আসছে, ততদিন দাদার বাইরের ঘরটা ত পড়েই রয়েছে, আর, পূজোর ছুটির আগে ত দাদার আসা হচ্ছে না।"

"তা বটে, কিন্তু তোদের তাহ'লে আজকালের ভেতরেই ঘরটা সাফসুদরো করে দিতে হবে—যে জঞ্জাল হয়ে রয়েছে!" বলিয়া হরিশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "এমন ছেলে কখন দেখিনি, যেমন চেহারা তেমনি গুণ।"

হরিশঙ্কর চলিয়া গেলে পর ভাতের হাঁড়িটাতে খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া সুভার বড় ভাজ কিরণশশি বলিল, "বিমল তোমাদের আপনার খুড়তুতো ভাই হয় নাকি ঠাকুর-ঝি?"

রান্নাঘরের একপাশে দেয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া একটা মেটে কলসীর ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া এক মুঠা মুগের ডাল বাহির করিয়া লইয়া সুভা বলিল, "বাবার বুঝি আপনার ভাই

কেউ ছিল, যে আমাদের আপনার খুড়তুতো ভাই কেউ থাকবে ?" কি বুদ্ধি তোমার বৌদিদি !"

"তাই ত আমি অবাক হয়ে গেলুম !"

ডালগুলাকে একটা ছোট পিতলের গামলায় রাখিয়া তাহাতে খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া চট্‌কাইয়া ধুইতে ধুইতে সুভা বলিল,. "আপনাব ত নয়ই—দূরসম্পর্কেও সে আমাদের কেউ হয় না, বিমলদাদাবা আগে আমাদেব এই গ্রামেই থাকতো, সে বলছি আজ ১৪, ১৫ বছর আগেকার কথা—তখন আমি খুব ছোট্ট, বিমলদার বাপের সঙ্গে বাবার খুব ভাব ছিল, তাই তাঁকে আমরা "কাকাবাবু," "কাকাবাবু," বলে ডাকতুম। এখন যে বাড়ীটাতে মিত্তিবরা রয়েছে না—ঐটে ছিল বিমলদাদের বাড়ী—।"

সে আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মাঝখানে বাধা দিয়া কিরণ বলিয়া উঠিল,—"আজ চাব দিন হোলো ভগলপুর থেকে কোন চিঠিপত্তর এলো না কেন বল দেখি ঠাকুর-ঝি ?"

হঠাৎ বাধা পাইয়া একটু বিরক্ত হইয়া সুভা বলিল, "তোমার সব তাতেই একটু বাড়াবাড়ি কিন্তু বৌদিদি !—স্বামী যেন কারুর হয় না, কেবল তোমারি যা হয়েছে !"

কথাটা কিরণের আদবেই ভাল লাগিল না, সে মুখখানাকে তোলো হাঁড়ির মত করিয়া উনানের দিকে ফিরিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

সেই দিনই বৈকালের দিকে সুভা পুকুরঘাট হইতে গা ধুইয়া ফিরিয়া সবেমাত্র ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া শরৎ ব্যস্ত-সমস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বিমলবাবুর কোন চিঠিপত্তর এসেছে নাকি সুভাদি?"

ভিজে কাপড়টাকে ঘরের কোণের দালানটায়, একটা দড়িতে ঝুলাইয়া দিতে দিতে সুভা বলিল, "হ্যাঁ এসেছে, কেন বল দেখি?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল,—"কাল আসবেন লিখেছেন ত?"

"কৈ তাত কিছু লেখেন নি, কেবল লিখেছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই যাচ্ছি।"

অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল যাহোক—কি যে করি তার ঠিক নেই।"

"কেন, কি হয়েছে তাই বল না—তুমি যে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লে দেখছি!"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "করতে হবে ত সবই আমাকে,—আর কেউ ত আর ঝক্কি পোয়াতে আসবে না, নাঃ এমন কল্লে আর পারা যায় না; আমি এবার থেকে পষ্ট বলে দোবো, আমার দ্বারা কিছু হবে না, যেদিকে না চাইবো সেই

দিকেই একটা না একটা গণ্ডগোল বেধে বসে আছে,—আমারি যেন যত মাথাব্যথা! তুমি হাসছো সুভাদি আমার যে কত জ্বালা তা যদি বুঝতে!"

"কি হয়েছে তাই খুলে বল না ভাই!" বলিয়া সুভা দালানের একধারে একটা খিলানের গায়ে ঠেস দিয়া বসিল।

মেঝের উপর অত্যন্ত বেথাপ্পাভাবে বসিয়া পড়িয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "বিমলবাবুরও কি ছাই একটু আক্কেল আছে? কবে আসবেন তা ঠিক করে লিখলে সেই বুঝে কাজ করতে পারি। আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, 'কাল গিয়ে পৌছোচ্ছি', আবাব তোমাদের চিঠিতে লিখেছেন, 'দু'এক দিনের মধ্যেই যাচ্ছি',—এর কোনটে যে ঠিক তা কি করে বুঝি বল দেখি?"

একটু হাসিয়া সুভা বলিল, "তা জেনেই বা তোমার কি হবে শুনি?"

"হুঁঃ,—বলে কি হবে!—অতবড় একটা লোক গ্রামে আসছেন, তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করতে হবে না?"—কাথাটা শেষ করিয়াই সে বুক পকেটের ভিতর হইতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাবে একটা ভাঁজ করা ফুলিস্কেপ কাগজ বাহির করিয়া সুভার সুমুখে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই দেখ না, কর্ম্ম ভোগ!—আমারি যেন যত দায়, কেন রে বাবু—গাঁয়ে কি আর ছেলে নেই—একটা কবিতা লিখতে কেউ পারে না?"

আশীর্ব্বাদ

কবিতাটা পড়িয়া ফেরত দিয়া সুভা বলিল, "গাঁয়ের সব ছেলেই কি আর কবিতা লিখতে পারে ঠাকুর-পো?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া শরৎ বলিল, "হ্যাঁ, এর আর শক্তটা কি!—তুদিন চেষ্টা কল্লেই সকলেই পারে, এই ত, এ কবিতটা পনের মিনিটের ভেতরেই লিখে ফেল্লুম—ভারি ত শক্ত কাজ!"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া সুভা বলিল, "আমাকে একটু কবিতা লিখতে শিখিয়ে দেবে শরৎ?"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শরৎ বলিয়া উঠিল, "সত্যি সত্যি শিখবে সুভা-দি? ওঃ, তাহলে যা ভালো হয়! আমি তোমাকে তুদিনে শিখিয়ে দেবো—কিচ্ছু না এই ধরনা, তুমি বল্লে "রজনীর কাল ছায়া পড়েছে বিটপী শিরে"—কটা অক্ষর আছে, প্রথমে একবার গুনে দেখ, এক, তুই, তিন, চার—"

হঠাৎ বাধা দিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "তাই বলে এখুনি শিখছিনা; ভাল দিন দেখে—হাতে খড়ি নিয়ে দস্তুরমত করে শিখতে হবে, একি ছেলে খেলার জিনিষ শরৎ!"

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "সে আমি আগে থাকতেই জানি, তুমি কেবল মুখেই বল শিখবো—ওসব তোমার চালাকি, আমি যেন কিছু বুঝি না।"

একটু হাসিয়া সুভা বলিল, "আসল কথা কি জান শরৎ, ও

সব জিনিষ চেষ্টা করে হয় না, যার ভেতরে আছে আপনি ফুটে বেরোয় ;—সকলেই চেষ্টা করলে যদি কবি হতে পারতো, তা হলে কি আর ভাবনা থাকতো শরৎ।"

হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শরৎ বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ বৌদিদি, যামিনীবাবুও সেদিন ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন ; ওঃ যামিনীবাবু যা কবিতা লিখতে পারে সুভাদি—একবারে চমৎকার! তুমি তাঁর কবিতা পড়নি বুঝি?—আচ্ছা এইবার যেদিন আসবো, নিয়ে আসবো ; যামিনীবাবুর কাছে কত ছেলে কবিতা শিখতে যায় ত—তিনি কিন্তু কাউকে উৎসাহ দেন না, বলেন, মিথ্যে কেন চেষ্টা করবে বাবু, সকলের ভেতরে কি আর—।"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই সুভা বলিয়া উঠিল, "তোমাকে খুব উৎসাহ দেন—নয় শরৎ?"

ঘাড় চুলকাইয়া, হাত কচলাইয়া শরৎ বলিল, "আমাকে বলেন, "তোর ভেতরে খুব বড় জিনিষ আছে!" আমার বোধ হয় যামিনীবাবুর ওটা ভুল—আমাকে একটু বেশী ভালবাসেন কিনা—তাই বোধ হয়—"

বাধা দিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "তিনি ঠিকই বলেছেন, আমরা মেয়েমানুষ, কিছুই লেখা পড়া শিখিনি ত, তবুও তোমার কবিতা পড়তে পড়তে—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই শরৎ বলিয়া উঠিল, "সত্যি বলছি সুভাদি, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর তাহলে দু'দিনে কবিতা লিখতে শিখে যাও, কিচ্ছু না, কেবল রোজ খানিকক্ষণ করে যদি চেষ্টা কর ; সত্যি বলছি তোমার খুব শিগ্‌গির হবে সুভাদি।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া সুভা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল শরৎ, আমি ঠাকুর ঘরের পাট করবো, আর তুমি চৌকাঠের উপর বসে বসে গল্প করবে।

শরৎ বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—সে অত্যন্ত উদাসভাবে উত্তর দিল, "না, থাক্‌গে—আমি বাড়ী যাই।"

এরি মধ্যে কেন ভাই ?—না না, একটু পরে যেও—লক্ষ্মিটি," বলিয়া সুভা শরতের মুখের দিকে চাহিল।

"আচ্ছা চল !" বলিয়া শরৎ সুভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া

৩

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লালু, খালের ধারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। ওপারে একটা লম্বা করোগেটের গুদামের পাশেই আকাশটা একেবারে লালে লাল হইয়া গিয়াছে।

দূরে একটা বোঝাই নৌকা হইতে তীরে মাল নামান হইতেছিল, তাহারি কোলাহল বাতাসে অস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

তখন পর্য্যন্ত অন্ধকার নামে নাই, কেবল আসন্নসন্ধ্যার একটা আচ্ছন্ন ভাব দুনিয়ার উপর একটু একটু করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দুপুর মড়ার মত ঘুমাইয়া, এই কিছুক্ষণ হইল লালু জাগিয়া উঠিয়াছে এবং একটা অলস জড়তা, তার সমস্ত শরীর এবং মনের উপর তখন পর্য্যন্ত চাপিয়া বসিয়াছিল।

খালের ধার দিয়া দিয়া একটা লোক, একটা প্রকাণ্ড লম্বা কাছি ধরিয়া হেলিয়া পড়িয়া টানিতে টানিতে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, এবং তাহারি আকর্ষণে, খালের মাঝখানে একটা মালবোঝাই গাধাবোট অত্যন্ত মন্থর গতিতে মূর্ত্তিমান জড়তার মত একটু একটু করিয়া জলে ভাসিয়া চলিতেছিল।

ক্রমে একটু একটু করিয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ওপারের লাল আকাশটা ক্রমেই ঘোলাটে হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। আজ সমস্ত দুনিয়াটা লালুর কাছে একটা স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। অন্ধকারে দূরে পোলের ঠিক নীচেটায়, গোটা কতক নৌকা বাঁধা ছিল, তাহাদের ছাউনির ভিতর মিট্‌মিট্‌ করিয়া ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল এবং সেই আধ আলো আধ অন্ধকারের ভিতর কাল কাল ছায়ার মত গোটাকতক মূর্ত্তি

চলাফেরা করিতেছিল। ওপার দিয়া একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, সারাদিনের পর বাড়ী ফেরার পথে অলস মন্থর খালি গাড়িটার উপর বসিয়া, গলাটাকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তীব্র আর্ত্তনাদের মত তার গানের সুর বাতাসে বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল, তাহারি ক্ষীণ এক আধটা তান খালের বুকের সজল বাতাসে মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত ওপার হইতে এপারে ভাসিয়া আসিতেছিল।

অলসভাবে একটা হাই তুলিয়া লালু খালের ধারের গড়ানটার উপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিন তার পেটে একবিন্দু জলও পড়ে নাই, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই নিশ্চেষ্ট জড়তার স্বপ্নটাকে নষ্ট করিয়া অতিবড় কেজোলোকের মত আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে আজ তার কেমন যেন ইচ্ছা হইতেছিল না; সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বিশ্বদুনিয়ায় সে একা—একেবারেই একা। মাথার উপরকার বিরাট কালো আকাশটার দিকে চাহিয়া সে যতই ভাবিতে লাগিল, দুনিয়ায় তার কোন বন্ধন নেই, ততই তার প্রাণটা যেন খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতে লাগিল এবং একটা বিরাট শূন্যতা তার বুকের মাঝখানে যেন মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতে লাগিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, এবং হঠাৎ কি মনে করিয়া [illegible]

ধারের বড়রাস্তাটার উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পথটা পার হইয়া, অপরদিকের ফুটপাথের উপর আসিয়া পড়িয়া, লক্ষ্যহীনভাবে উত্তর দিকে চলিতে সুরু করিয়া দিল। কিছুদূর এইভাবে চলিয়া আসিয়া হঠাৎ একটা খোলারঘরের নিকটে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খোলারঘরটার পাশ দিয়া একটা সরু অন্ধকার গলি চলিয়া গিয়াছে। সেই গলির মুখটাতে একটি কালো শীর্ণদেহ স্ত্রীলোক, ছেঁড়া এবং মলিন এক-খানি কাপড় পরিয়া মুখময় খানিকটা খড়ি মাখিয়া জ্যান্ত একটা বিড়ম্বনার মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তার সেই বিষাদময় রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইযা রহিল, তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া নিজের ট্যাক্‌টাকে ঝাড়া দিয়া, সঙ্গে যে কটা পয়সা ছিল সেই স্ত্রীলোকটার হাতে বোঁ করিয়া গুঁজিয়া দিয়া, একটিও কথা না বলিয়া, ঝড়ের মত বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া অবশেষে আবার সেই খালের ধারে আসিয়া ঘাসের উপর সে শুইয়া পড়িল। আজ জীবনটা তার নেহাতই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল, এত ফাঁকা যে তার মত ভবঘুরের পক্ষেও সেটা যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছিল। অন্ততঃ একটুখানি বন্ধন যেন আজ তার পক্ষে

নেহাতই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, একেবারে ভয়ানক নীরব, কেবল অনেক দূরে, কাহারা শব বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাদেরি উচ্চ হরিধ্বনি এলোমেলো দমকা বাতাসে কখন জোরে জোরে এবং কখনও বা অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল, ক্রমে সে আওয়াজটুকুও ক্ষীণ হইয়া আসিয়া, থামিয়া গেল—চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। লালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কি মনে করিয়া আবার সেই পথে আসিয়া পড়িল। ও ফুটপাথের দিকে চাহিয়া সে অন্ধকারে ঠাওর করিয়া করিয়া দেখিল, সেই স্ত্রীলোকটা, সেই গলিটার ধারে তখনও পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কি মনে করিয়া একছুটে তাহার নিকট আসিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "আমাকে তোমার ঘরে আজ রাত্তিরটা থাকতে দেবে?"

অবাক হইয়া এই অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে হতভম্বের মত চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "কেন দোবো না মশাই, আমাদের কাজইত এই।—" তার গলার স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কম্পিত।

"তবে চল," বলিয়া লালু সেই স্ত্রীলোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং একটুখানি চলিয়াই, বাঁ-দিকের একটা দরমা-ঘেরা নীচু ভাঙ্গা খোলার

চালার ভিতর সেই স্ত্রীলোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। ঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার; একটা ভাঙ্গা দেবদারু কাঠের ছোট বাক্সর উপর, একটা কেরোসিনের ডিবে একরাশ ভূষা উড়াইয়া নিব নিব করিয়া জ্বলিতেছে। একপাশে একটা ছেঁড়া দর্ম্মার উপর, একখানা কালো ময়লা জীর্ণ শাড়ি এলোমেলো ভাবে পাতা এবং তাহারি একধারে একটা তেলধরা পুরাণো খেরোর বালিশ বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

সেই অতিবড় মলিন শয্যাটার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ পিছন, চাহিয়াই লালু সহসা থমকিয়া গেল, ঘরের সেই অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিতে পাইল, সেই কালো কুৎসিত মেয়েটা অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে এবং অত্যন্ত তাড়তাড়ি তার এই অন্যদিকে ফিরিয়া থাকার অবসরটুকুর মাঝখানে নিজের কুৎসিত মুখখানাকে, তার সেই শতছিন্ন মলিন শাড়ীটার খুঁট দিয়া অত্যন্ত জোরে জোরে এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘসিয়া মাজিয়া একটু সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেগে গিয়া তার হাতটাকে অত্যন্ত জোরে চাপিয়া ধরিয়াই হঠাৎ লালু ছাড়িয়া দিল, মেয়েটার সর্ব্বশরীর একবারে আগুনের মত গরম।

"একি! তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?"

অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "না, না, আপনি যাবেন না,—যাবেন না! আমার গা শুধু শুধু অমনি গরম

আসিতেছে সে স্ত্রীলোক।—সে হঠাৎ লাফাইয়া পড়িয়া, স্ত্রীলোকটার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া, জোর করিয়া গলাটাকে কঠোর করিয়া তুলিয়া, বলিয়া উঠিল, "সঙ্গে যা কিছু আছে ফেলে দিয়ে যাও, নইলে খুন করে ফেলবো।" স্ত্রীলোকটা ভয়ে কাঁপিতেছিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, ঘরে আমার ছেলে ভুগছে—তার জন্যে ওষুধ কিনতে যাচ্ছি—দোহাই তোমার আমাকে ছেড়ে দাও—।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে স্ত্রীলোকটাকে একটা ঝাঁকুনি মারিয়া, ছাড়িয়া দিয়া লালু বলিয়া উঠিল, "তবে মরগে যা!" স্ত্রীলোকটা ছাড়া পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া লালু অন্ধকার পথে চলিতে আরম্ভ করিল। অনেক দূর আসিয়া, একটা প্রকাণ্ড বাগানের মস্তবড় একটা ফটকের সামনে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল,—অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, বাগানের মাঝ বরাবর, গাছের ফাঁকে ফাঁকে, একটা বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে। আস্তে আস্তে সে বাগানের অনুচ্চ প্রাচীরটা ধরিয়া কিছুদূরে সরিয়া আসিল এবং তারপর একস্থানে আসিয়া [illegible] পাঁচিলটাকে টপকাইয়া, বাগানের মধ্যে গিয়া পড়িল।

বাড়ীটার দিকে চাহিয়া লালু দেখিল, উপরে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে—বাদবাকি সব অন্ধকার। সে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাগানেব ঠিক ধাবেই নীচেকার, একটা ঘরের সার্সির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া লালু দেখিল, সার্সিটা ভিতর দিক হইতে বন্ধ. সে পায়েব তলা হইতে একটা ছোট ঢিল কুড়াইয়া লইল এবং আস্তে আস্তে সেই ঢিলটা কাচেব গায়ে ঠুকিতে আরম্ভ করিল। একটু একটু কবিয়া কাচটা খসিয়া পডিতে লাগিল। হাত চালাইয়া দিবার মত যখন খানিকটা ফাঁক হইল, তখন লালু ঢিলটাকে ফেলিয়া দিযা, আস্তে আস্তে সেই ভাঙ্গা কাচটার ভিতর দিয়া অত্যন্ত সাবধানে হাতটাকে পুরিয়া দিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল এবং সার্সিটাকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া. অত্যন্ত, সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে আবার সেই পথ দিয়াই বাহির হইয়া আসিল,—হাতে তার একটা ছোট টীনের বাক্স।

ভাঙ্গা সেই চালা ঘরটার ভিতর মলিন শয্যায় শুইয়া সেই মেয়েটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—হঠাৎ কান্নার জোর ঝাঁকুনি খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তার মুখটাকে হাত দিয়া চাপিয়া

ধরিয়া লালু বলিয়া উঠিল, "চেঁচিও না!" তারপর সে, আলোটার ধারে গিয়া বসিয়া, সেই ছোট টীনের বাক্সটাকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং অত্যন্ত উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল—"উঠে এসো এদিকে!"

বাক্সটার একটা খুবরিতে, গোটা চারেক টাকা আর কিছু রেজকি ছিল, সেগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপরে এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িল,—লালু চীৎকার করিয়া উঠিল—"কুড়িয়ে নাও, কুড়িয়ে নাও! ও টাকা সব তোমার।"

মেয়েটা প্রথমে অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া টাকা কুড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

লালু হঠাৎ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরো আছে, আরো আছে!—ওঃ অনেক টাকা,—দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ,—এ সব তোমার—"; কথাটাকে শেষ করিয়াই সে এক গোছা দশটাকার নোট মেঝের উপর ছড়াইয়া দিল; তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া একটা দশটাকার নোট কুড়াইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "এটা আমি নিই—আমার বড্ডো দরকার—"; কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল—"না, না, আমি কিছু নেবো না—ও সবই তোমার।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে হাতের নোটটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সহসা কি মনে করিয়া অত্যন্ত জোরে সেই মেয়েটাকে

নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব আনন্দ হচ্ছে তোমার ?—খুব—খুব ?—একটুও দুঃখু নেই—মোটে না ?"—তারপর হঠাৎ এক সময় তাকে ছাড়িয়া দিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "চল্লুম, চল্লুম ! —আর হয়ত দেখা হবে না ।"—কথাটা শেষ করিয়াই সে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

৭

বেলা প্রায় দশটা হইবে ; রান্নাঘরের কোণের কাছে যে রৌদ্রটুকু আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারি নিকট বসিয়া সদ্যস্নাতা সুভা তার ভিজে চুলগুলা এলাইয়া দিয়া শুকাইয়া লইতেছিল । হঠাৎ বাহির হইতে হরিশঙ্করের গলা পাওয়া গেল, "ওরে সুভা, তোর বিমলদা এসেছে যে রে !'

নিমেষের মধ্যে মাথার কাপড়টাকে টানিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া,সুভা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া, হরিশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন, "তুই যে লজ্জায় একেবারে মাটির ভেতর সেঁদিয়ে যাবি দেখছি, আচ্ছা পাগলী মেয়ে যাহোক্—বিমলকে আবার লজ্জা কিরে সুভা ?"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি গৌরবর্ণ দোহারা যুবক কৌতুহল দৃষ্টিতে সুভার দিকে একবার চাহিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত-ভাবে বলিয়া উঠিল, "সুভা এত বড় হয়ে গেছে? ওরে বাবা! আমি সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেছি কাকাবাবু!"

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুভা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল এবং উঠিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"হয়েছে, হয়েছে, আর নমস্কার করতে হবে না," বলিয়া বিমল ভাল করিয়া একবার সুভার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল এবং অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "না, সত্যি কাকাবাবু, আমার ভারি আশ্চয্য বোধ হচ্ছে, সেদিনকার একরত্তি মেয়ে, এরি মধ্যে এত বড় হয়ে গেছে!"

একটু হাসিয়া হরিশঙ্কর বলিলেন, "আর তুমি বুঝি সেইটুকুই আছ বাবা? সেই এতটুকুটি দেখেছিলুম—তারপর—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ কোথা হইতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া শরৎ চেঁচামেচি করিতে সুরু করিয়া দিল, "আসবার সময় আপনার একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল বিমলবাবু—দেখুন দেখি, আমরা কি জানি আজ আসবেন, তাহলে ষ্টেশনে ছেলেরা নিশেন হাতে করে ভোর থেকে দাঁড়িয়ে থাকতো, নাঃ, এ আপনার ভয়ানক অন্যাই কিন্তু; কিছু না, কেবল

একটু যদি খবর দিতেন যে অমুক ট্রেনে যাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ।" বলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে শরৎ মাথায় হাত দিয়া রকের একধারে বসিয়া পড়িল।

"বড্ডই অন্যাই হয়ে গেছে ভাই, কিছু মনে কোরো না, কি জান, আসল কথা—আমার নিজেরই ঠিক ছিল না, কবে যাবো," বলিয়া বিমল শরতের নিকট গিয়া উপু হইয়া বসিতেই, হরিশঙ্কর শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ওরে সুভা, একটা মাদুর টাদুর এনে রকটার ওপর পেতে দেনা মা!"

মুখ না তুলিয়াই শরৎ বলিল। "আগে না হয় ঠিক ছিলনা কিন্তু যখন ঠিক হোলো তখন একটা টেলিগ্রাম করে দিলেন না কেন?"

বিমল এবার হাসিয়া ফেলিল, সুভা এই সময় একটা মাদুর আনিয়া রকের উপর মেলিয়া পাতিয়া দিল। সকলে তাহার উপর উঠিয়া বসিলে, শরৎ আবার আরম্ভ করিল, "আজ সাতদিন থেকে ছেলেরা রাত্তির জেগে গান তৈরী করে রেখেছে—ষ্টেশন থেকে গাইতে গাইতে আসবে," এই অবধি বলিয়াই শরৎ থামিয়া গেল, ক্ষোভে দুঃখে তার গলার স্বর প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

অত্যন্ত স্নেহভরে তার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বিমল বলিল, "বেশ তো, ও বেলা সে গান শোনা যাবে এখন, তার

আর হয়েছি কি ! কে জানে ভাই তোমরা এত কাণ্ড কর্বে, তা'হলে কি আর আগে থাকতে জানাতুম না ? এত বড় মাষ্টা কে আর সখ করে খোয়ায় বলো দাদা ।"

একটু হাসিয়া হরিশঙ্কর বলিলেন,—"ওকে তুমি চেননা বোধ হয় বিমল— ?"

"আজ্ঞে না ।" বলিয়া বিমল হরিশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

"ওপাড়ার হরিশমুখুয্যেকে মনে পড়ে তোমার ? বথতলার ঠিক ধারেই একতালা সাদা বাড়ী ?"

"খুব মনে পড়ে", বলিয়া বিমল হঠাৎ সুভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার বোধ হয় মনে পড়ে না সুভা, ঐ হরিশমুখুয্যেদেরই নেড়াছাতের ওপর বসে সেবার কাকিমা, আমি, তুমি সব রথ দেখছিলুম, ছাতের ওপর পাড়ার যত বাড়ীর মেয়েরা সব জড় হয়েছে—একবারে ঠেসাঠেসি মারামারি—হঠাৎ কাকিমার হোলো ফিট—সে কি কাণ্ডরে বাবা !—মনে পড়ে সুভা ?"

মৃদুকণ্ঠে সুভা বলিল, "স্বপ্নের মত একটু একটু যেন মনে পড়ে ।"

"হাঁ হরিশমুখুয্যেদের কথা কি বলছিলেন কাকাবাবু ?" বলিয়া বিমল হরিশঙ্করের দিকে চাহিল ।

শরতের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে

হরিশঙ্কর বলিল, "এই যে পাগলা ছেলেটী দেখছ, এটি হচ্ছে হরিশদার ছোট ছেলে।"

"ও হরি, এ সেই শরৎ নাকি? বলেন কি কাকাবাবু! সে এই এত বড় হয়েছে? ওঃ, ওকে সেই এতটুকুটি দেখে গেছলুম। ওদের বাড়ীতে ছেলে বেলায় কত উৎপাতই করে এসেছি," তারপর হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শরতের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "মাসিমার শরীর বেশ ভালো আছে?"

"হুঁ," বলিয়া শরৎ আপনার মনে দাঁত দিয়া নিজের আঙুলের নখগুলো কাটিয়া কাটিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল।

"ওঃ, তোমাদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় যা উৎপাতটা করতুম," কথাটা শেষ করিয়াই বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন কাকাবাবু, মাসিমার মত এমন সুন্দর মন আমি খুব কম লোকের দেখেছি," তারপর হঠাৎ শরতের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসিমাকে বোলো, তাঁর ওখানে আমার আজ রাত্তিরে নেমন্তন্ন রইলো—ভুলে যেও না যেন, আর, আজ বিকেলে তোমাদের গান আমাকে শোনাতেই হবে, তা না হলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব।"

সুভা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এইবার কথা কহিল, "শরৎ আমাদের কত বড় একজন কবি হ'য়ে উঠেছে তা বুঝি জানেন না বিমল দা!"

কথাটা শেষ না হইতেই, হঠাৎ হরিশঙ্করের দিকে চাহিয়া, বিমল বলিয়া উঠিল, "দেখুন কাকাবাবু, আমাদের দেশের ছেলেগুলো কোন জিনিষই ঠিক চোখ মেলে দেখে না, মাসিক পত্রিকা খুলে দেখুন, বেরুচ্ছে কিনা যত রাজ্যের প্রেমের কবিতা, দেশের লোকে এদিকে খেতে পাচ্ছে না, এ সময় তারা বসন্ত আর দখিনা বাতাস নিয়ে কি করে যে কবিতা লেখে তাত বুঝতে পারি না, এত বড় নির্ব্বিকার জীব বোধ হয় স্বয়ং মহাদেবও ছিলেন না। আসল কথা, এরা অনুভব করে কিছুই লেখে না। —সেই মান্ধাতার আমলের বাঁধাবুলি আওড়ে যায় মাত্র।"

সুভা একবার শরতের দিকে চাহিল, শরৎও ঠিক সেই সময় সুভার মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ চোখোচোখি হইয়া যাওয়ায় মুখ নীচু করিয়া লইল এবং হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি তা'হলে এখন আসি

"তা এস, কিন্তু মনে থাকে যেন, আজ রাত্তিরে তোমাদের বাড়ীতে আমার নেমন্তন্ন রইলো।"

কেবল সংক্ষেপে "হুঁ" বলিয়া শরৎ চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই শরতের-মা রান্নাঘরে, উনানের সুমুখে বসিয়া, কি একটা তরকারীতে লঙ্কা ফোড়ন দিতেছিলেন, হঠাৎ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াই, নাকে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া বিমল বলিয়া উঠিল, "তুমি যে একেবারে মানুষ মারবার যোগাড় করে তুলেছ মাসিমা।"

"কে রে—বিমল বুঝি?—জুতোটাকে ছেড়ে ঘরে আয়—ঘরে আয়।" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা সাঁতলান তরকারীটাকে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দু'চারবার নাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাড়াতাড়ি ঘটির জলে হাত ধুইয়া, একটা খুরসিপিঁড়ে আগাইয়া দিয়া বলিলেন:—

"আরে বোস,—নে তোকে আর নমস্কার করতে হবে না, অমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি।"

পিঁড়েটার উপর বসিয়া পড়িয়া বিমল বলিল, "তুমি কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছ মাসিমা।"

একটু হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বয়স ত আর কমছে না বাবা, দিন দিন বাড়তেই চলেছে, তোর শরীরটাও ত ভাল দেখছি না বিমল।"

হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, বিমল বলিল, "তুমি

এইবার সত্যি সত্যি হাসালে দেখছি মাসি-মা, এর চেয়ে ভালো শরীর করতে গেলে—"।

বাধা দিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "নারে, আমি ঠাট্টা করছি না, সত্যি সত্যি তোর ছেলেবেলাকার সে চেহারা আর নেই।"

"থেকেও কাজ নেই মাসিমা!—নিজের ছেলেবেলাকার চেহারা অবশ্য আমার মনে নেই, তবে তুমি যে রকম বলছ, তাতে করে মনে হয়, সে সময় একটী কুপো-বিশেষ ছিলুম আর কি—" কথাটাকে শেষ করিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া বিমল বলিল, "হ্যাঁ গা মাসি-মা, কলুদের সেই দীনবন্ধু নাকি মারা গেছে!"

"হ্যাঁ বাবা, সে মারা গেছে; মোটার কথা উঠতে তার কথা বুঝি মনে পড়ে গেল তোর?—আহা, বাছা, তিন দিনের জ্বরে মারা গেল," বলিয়া অন্নপূর্ণা উনান হইতে কৈ-টা নামাইয়া লইয়া, একটা কানাউঁচু কাঁসার পাত্রে তরকারীটা ঢালিয়া রাখিলেন।

হঠাৎ কি মনে করিয়া বিমল বলিল, "শরতকে যে বড় দেখছিনা মাসি-মা?"

"এই মাত্তর সে ত বাড়ীতেই ছেলো," বলিয়া গলাটাকে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "ওরে অ শরৎ, তোর বিমল-দা এসেছে যেরে!"

পাশের ঘর হইতে শরৎ উত্তর দিল, "এই যাই।"

"শুধু আসলেই হবে না, তোমার কবিতার খাতা নিয়ে এসো, কি কথা ছিল মনে নেই," বলিয়া বিমল আবার আরম্ভ করিল, "এখনও রথের সময় তোমাদের ছাতে তেমনি করে লোকের ভীড় হয় মাসিমা ?"

"তেমন আর হয় না বাবা, এই কবৎসরের মধ্যেই গ্রামটা কেমন যেন মুসড়ে গেছে, ছেলে মেয়েদের মুখেও সে হাসি নেই, আর ছেলের মাদের প্রাণেও আর সে আনন্দ নেই, সবই যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে, তা না হলে রথ ত সেই আছে, মেলাও তেমনিই বসে, কিন্তু তেমনটি যেন আর হয় না বিমল !" বলিয়া অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের ছোট ঝুলপড়া জানালাটার ভিতর দিয়া পাশের পোড়ো জমিটার দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ কি মনে করিয়া বিমল ডাক দিল, "কৈ হে শরৎ, তোমার কবিতা নিয়ে এসো না হে !"

"আজ্ঞে যাই।" বলিতে বলিতে শরৎ আসিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইল।

"তুমি খুব ছেলে তো যাহোক, সকাল বেলায় অত লাফালাফি —হ্যান্ করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা, আর এখন দিব্যি গোবেচারাটি সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?—তোমার গান শোনালে না, আমাকে একটা অভ্যর্থনাও করলে না—এতবড় লোকটা দেশে ফিরে এসেছি, কি বল মাসি-মা !"

"ওর খেয়ালের কথা আর বলিস্ কেন, তুই আসবি শুনে থেকে ছেলের নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ—কোথায় কবিতা লেখারে, কোথায় নিশেন যোগাড় রে, কোথায় পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে গান শেখান রে,—আমি বলিবা কোন্ লাট সায়েবই বা আসছে। ছেলেকে জিজ্ঞেসা করলুম, কে আসছে রে? বল্লে, সে মস্তবড় একজন লোক—তুমি চিনবে না, শেষকালে শুনলুম কে আসছে, না আমাদের বিমল, যত বলি, ওরে তাকে আমরা কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি—ছেলের বিশ্বাসই হয় না।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিমল বলিল, "আচ্ছা মজা হয়েছে ত!"

"মজা বলে মজা—আমি ত হেসেই খুন্! সে, ছেলের বক্তৃতা দেখে কে!—তিনি হ্যান করেছেন, ত্যান করেছেন, আরে বাবু যতই করুক না কেন, সে আমাদের কাছে ত সেই বিমলই আছে! সে কি ছেলে শোনে।"

ঘরের মধ্যে একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল এবং হাসির বেগটা একটু কমিতেই বিমল হঠাৎ উঠিয়া গিয়া শরতের হাতটা ধরিয়া জোর করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিয়া, নিজের পাশে বসাইয়া, বলিয়া উঠিল, "দ্যাখ মাসিমা, শরতের বয়েস যা হয়েছে তার চেয়ে ওর স্বভাবটা ঢের ছেলেমানুষের মত—নয়? ওর বয়স কত হোলো আন্দাজ মাসি-মা?

"তা মন্দ কি—এই আশ্বিনে বুঝি ২১ বছরে পড়বে।"

"কিন্তু, ওর স্বভাব দেখলে তাকি মনে হয় মাসি-মা ?"

শরতের দিকে স্নেহপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন "ওর ছেলেমাস্থষি চুল পাকলেও বোধ হয় যাবে না।"

শরৎ এবার আর থাকিতে পারিল না—সে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "ছেলেমান্থষী আমার কোন জায়গাটায় দেখলে বল ত মা ?"

"কোনখানটা না দেখি, আগে তাই বল দেখি ?" বলিয়া শরতের-মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শরৎ কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিমল বলিয়া উঠিল, "আরে পাগল, বুড়োবয়েস অবধি ছেলেমাস্থষ থাকাটা কম সৌভাগ্যের কথা বুঝি ?"

কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়াই শরৎ বলিয়া উঠিল, "আপনি জানেন না বিমলদা, মা, যার তার কাছে, যখন তখন আমার নিন্দে করে বেড়ায়।"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া বিমল বলিয়া উঠিল, "এযে তোমার অন্যাই মাসি-মা ; ও বেচারা কোথায় দিন দিন একটু একটু করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, একটা কেষ্ট বিষ্টু কিছু হবার চেষ্টা করছে, আর তুমি কিনা ওকে নিয়ে যার তার কাছে ন্যাকড়া ছ্যাকড়া করে বেড়াও—এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু।

আশীর্ব্বাদ

হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "মনে করেছিলুম আপনাকে কবিতা শোনাবোনা, কিন্তু এখন দেখছি না শোনালে চলছে না ; আপনি কিন্তু মন দিয়ে শুনবেন, তারপর শুনে ঠাট্টা করতে হয় করবেন আর ছেলেমানুষ বলতে হয় বলবেন," বলিয়া ঝড়ের মত শরৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে কোথা হইতে একটা চকচকে বাঁধান খাতা আনিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিমলের সুমুখে বসিয়াই, কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া, গদগদস্বরে গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, একটি একটি করিয়া খাতার কবিতাগুলি শুনাইয়া যাইতে লাগিল। একটা, দুটা, তিনটা, কবিতা শেষ হইতেই বিমল বলিয়া উঠিল, "বাস্, আজ এই পর্য্যন্ত, একদিনে বেশী শুনতে নেই, তা'হলে সব জট পাকিয়ে যাবে।"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আর একটা শুনুন" এবং উত্তরের আপেক্ষা না করিয়াই সে হাত মুখ নাড়িয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

কবিতাটা শেষ হইতেই বিমল বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এত বেশ কবিতা হয়েছে, না ঠাট্টা নয় মাসি-মা, ও ত মন্দ লেখেনা দেখছি! আজে বাজে যে সব কবিতা আজকাল মাসিক পত্রিকায় বেরোয়, তার চেয়ে শরতের কবিতা আমার ঢের ভাল লাগলো। তবে একটা কাজ কোরো ভাই, একটু দুনিয়ায়

নেমে আসতে চেষ্টা কোরো, অত আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়িও না।"

ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে শরৎ বলিল, "কবি যামিনী বাবুও ঠিক ঐ কথাই বলেন বিমল-দা।"

"কে যামিনী বাবু?—যামিনী চাটুয্যে তো, আরে রামচন্দ্র, সে আবার কবি হোলো কবে থেকে—?"

"আপনি তাঁর কবিতা পড়েন নি—তাই—";

শরৎ আরো কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া বিমল বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব পড়েছি—তাকে আর আমি চিনি না? সে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে বরাবর পড়ে এসেছে, এমন গুঁচা ছেলে আর দুটি ছিল না,—সে আবার কবিতা লিখবে—হয়েছে আর কি! তার বিদ্যে জানতে ত আমার কিছু বাকি নেই—একটি আস্ত পাঁঠা বল্লেই হয়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল আবার বলিল, "দ্যাখ শরৎ, দেশের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে একটা কবিতা লিখে দিতে পার, সেইটে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে গাইয়ে ভিক্ষে করে বেড়ান যেতে পারে।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া, শরৎ বলিয়া উঠিল, "তাহলে বেশ হয় নয়?—ঠিক বলেছেন আপনি, ও চাঁদ ফাঁদ কিছুই নয়,—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি বিমল-দা! আজ রাত্তিরেই

তা হলে লিখে ফেলি—কি বলেন?" কথাটা শেষ করিয়াই শরৎ হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"দেখছো একবার ছেলের কাণ্ড, ও এখুনি লিখতে চোল্লো!" বলিয়া শরতের মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কাল সকালে লিখিস্ অখন, আজ খাওয়া দাওয়ার দফা শেষ আর কি!"

বিমল ডাকিল, "এখুনি দরকার নেই শরৎ—ধীবে সুস্থে লিখলেই হবে অখন।"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "এই দেখুন না, বান্না শেষ হবার আগেই লিখে নিয়ে আসছি।"

ইহার পরদিন বেলা বারটার সময়, বিমল আহারে বসিয়াছিল এবং নিকটে বসিয়া সুভা দেখা শুনা করিতেছিল।

"আজ কোথায় কোথায় ঘুরলেন বিমল-দা?" বলিয়া সুভা গায়ের কাপড়টা একটু ভাল করিয়া টানিয়া দিল।

ডালের বাটিটা হইতে খানিকটা ডাল বাড়া-ভাতের উপর ঢালিয়া দিতে দিতে বিমল বলিল, "ওঃ, তা অনেক জায়গা ঘোরা হয়েছে; ও পাড়ার রায়েরা কিন্তু যা ছোটলোকমীটা করেছে আজ—আরে ছিঃ ছিঃ!"

"খুব ছোটলোকমী করেছে নাকি ?"

"ওঃ ভদ্রলোকে যে এত নীচ হতে পারে তা আমার ধারণাতেই ছিল না। দরওয়ানজীর অনেক খোসামোদ করে, প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠকখানায় বসে থেকে থেকে, অনেক কষ্টে ত বাবুর দেখা পাওয়া গেল ; কোথায় এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইবে, তা নয় মুখখানাকে খিঁচিয়ে বলে উঠলো, "কে তোমরা ? কি চাই এখানে ?" সে এমনি বিশ্রী করে কথাকটা বল্লে, যেন আমরা তার বাড়ীতে কাঙ্গালী বিদেয় হতে গেছি ; আমার ত আপাদমস্তক জ্বলে গেল ! কি করি, যে কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, তাতে রাগ করবার ত জো নেই,—বল্লুম, "আমরা এসেছি কিছু চাঁদার জন্যে—গ্রামে একটা ছোটখাটো ন্যাশানাল স্কুল,—" বাস এই অবধি বলেছি কি লোকটা মুখখানাকে একবারে বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ব্যাটাই ইস্কুল খুলছে—যত রাজ্যের চোর জুটেছে—না না এখানে ওসব হবে টবে না !" আমরা ত অবাক ! প্রথমটা রাগ হয়েছিল, তারপর কিন্তু হাসি পেতে লাগলো।"

"আচ্ছা লোক ত যাহোক !" বলিয়া সুভা চুপ করিল।

"এ ত গেল রায়েদের বাড়ীর ব্যাপার ; তারপর ঘোষেদের বাড়ী গেলুম, সেখানে আর এক কাণ্ড বেধে বসলো। কর্ত্তামশাইকে ন্যাশানাল ইস্কুল খোলবার কথা বলতেই তিনি

অত্যন্ত মুরুব্বির মত একটু হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা গান্ধীর চেলা বুঝি?—তা বেশ বেশ, কিন্তু দ্যাখো বাবু—, অবশ্য বড়াই করতে চাই না, আমরাও ত লেখা পড়া শিখিছি—আর রাজনীতি জিনিষটা যে একবারে কিছুই না বুঝি এমন ত আর নয়; দ্যাখ এই গান্ধী লোকটা খাঁটী লোক হতে পারে কিন্তু বুঝলে কিনা, অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে—লোকটার মাথাটা বড্ডই মোটা," এই অবধি ঘোষজার আবভাব সমস্ত অবিকল নকল করিয়া বলিয়া, বিমল হঠাৎ হাসির বেগ সামলাইতে পারিল না এবং ফলে বিষম খাইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

"জল খান, জল খান।" বলিয়া সুভাও হাসিতে আরম্ভ করিল, এবং সে কতক প্রকৃতিস্থ হইলে বলিল, "ঘোষজা এখন পর্য্যন্ত আপনার নাম করছে দেখছি।"

কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া বিমল বলিল, "ওঃ, যা নাম করছে সে আর বলবার নয়, বাপরে! বুকে ব্যথা হয়ে গেছে," বলিয়া বিমল আবার হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং হাসির বেগটা একটু থামিলে বলিল, "লোকটার আর যা দোষ থাক, বিনয়ী যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কি বল সুভা!"

"সে আর একবার করে বলতে!" বলিয়া সুভা হঠাৎ বলিয়া

উঠিল, "ও বৌদিদি, বিমল-দার পাত যে খালি হয়ে এল, ভাত এনে দাও না গো!"

"না না আর ভাত লাগবে না," বলিয়া বিমল দুধের বাটিটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সুভা বলিয়া উঠিল, "হেসে হেসে পেট ভরে গেল বুঝি আপনার? না, না আর দুটিখানি ভাত দিয়ে যাক্।"

"তবে দাও!" বলিয়া দুধের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বিমল আবার আরম্ভ করিল, "চাঁদা যা কিছু সামান্য উঠেছে সব গরীবদের ঘর থেকেই পাওয়া, কাল ভাবছি ওপারের গ্রামগুলোতে একবার ঘুরে দেখবো,—যা ওঠে, তবে এক আশা আছে ওপারের মিত্তিরদের বাড়ী—সেখানে বোধ হয় মোটারকম কিছু—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই সুভা বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই দেবে, মিত্তিরদের সংব্যয় খুব আছে, আর ওরা এসব কাজে খুব উৎসাহ দেয়, এই সেবার বাঁড়ুয্যেদের বড়গিন্নী মেয়ের বিয়ের জন্যে গিয়ে ধরে পড়ল, তক্ষুণি একশো টাকার একটা নোট বার করে দিলে।"

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিমলের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া সুভা দেখিল, সে তন্ময় হইয়া তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে।

"কি লিখছেন বিমল-দা ?" বলিয়া সুভা ঘরে প্রবেশ করিল এবং রাস্তার দিকের একটা জানালার নীচেকার কবাট দুটো বন্ধ করিয়া দিয়া, জানলার কোলের সিমেণ্ট দেওয়া উঁচু ঢিপিটার উপর আস্তে আস্তে গিয়া বসিল।

তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিয়া বিমল বলিল, "ও একটা প্রবন্ধ লিখছি সুভা।"

"কি সম্বন্ধে বিমল-দা ?"

"এই, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আর কি।"

"আমাকে পড়ে শোনান না বিমল-দা!" বলিয়া সুভা সাগ্রহে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আচ্ছা শোনাচ্ছি, কিন্তু একি তোমার ভাল লাগবে সুভা ?—এযে বড্ড শুকনো জিনিষ!"

"খুব ভাল লাগবে—আপনি পড়ুন না!" বলিয়া হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়াই সুভা বলিয়া উঠিল, "কেও শরৎ ?—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই!"

একটা ছোট বাঁধান খাতা হাতে করিয়া শরৎ ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল এবং তক্তপোষের একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি লিখছেন বিমল-দা ?"

"ও কিছু নয়, একটা কাটখোট্টা প্রবন্ধ, আমরা হচ্ছি, কি জান, নেহাতই কেজো লোক—বুঝলে কিনা. কবিতা টবিতা

আমাদের ওসব অত আসে টাসে না, তা যাক্, তোমার সে কবিতার কতদূর ? শেষ করে এনেছ নাকি ?” বলিয়া বিমল শরতের হাত হইতে কবিতার খাতাখানা টানিয়া লইল এবং তৎক্ষণাৎ কি মনে করিয়া, ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, “কৈ কি লিখলে শোনাও দেখি ! শোন সুভা, শরতের কবিতা শোনো !”

“শরতের কবিতা ত, ও আমার শুনতে শুনতে কান পচে গেছে, ও অন্য সময় আপনি শুনবেন অখন, এখন আপনার লেখা পড়ুন দেখি,” বলিয়া সুভা শরতের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা, আচ্ছা, আগে কবিতাই শোনা যাক্. আসল কথা কি জানেন বিমল-দা, সেই যে কথায় বলে, গেঁয়ো যোগী ভিখ মেলে না, শরতের হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা সেই অবস্থা, আমরা ওকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি কিনা, আমাদের মনে হয়, ওর কবিতা আর শুনবো কি ? কিন্তু হয়ত বাইরে যারা ওকে চেনা না, তাদের কাছে ওর কবিতার কতই না আদর হয় ! ওর কবিতা আপনি শোনেন নি বুঝি ?”

“শুনেছি বৈকি !—এক আধটা নয়, দস্তুর মত পাঁচ ছটা, আর আমি ওর একজন ভক্ত হয়ে উঠেছি—তা জান না বুঝি ?” বলিয়া বিমল শরতের পিঠে খুব জোরে জোরে দুতিনটে চাপড়

মারিল এবং পরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিল, "কৈ পড় দিকিনি তোমার কবিতা—কি লিখেছ দেখি !—খুব লম্বা হয়েছে নাকি ?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শরৎ বলিল, "এখন থাক্, অন্য সময় হবে অখন !" তার মুখখানা একবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি চোট্‌লে নাকি শরৎ ?" বলিয়া কোলের বালিসটাকে সরাইয়া ফেলিয়া, বিমল খাড়া হইয়া বসিল এবং শরতের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ দেখছি, আরে ছিছি, এই টুকুতেই চটে গেলে !"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "শরৎ আমার ওপর সত্যি সত্যি চটে গেছে বিমল-দা, তাই বলে মনে করবেন না, ও আমার ওপর বেশীক্ষণ চটে থাকতে পারবে, এই দেখুন না এখুনি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—"।

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এখন যাচ্ছি বিমল-দা" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনেক রাত্রে খাওয়া দাওয়া সারিয়া শয্যার উপর শুইয়া শরৎ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিছুতেই তার ঘুম আসিতেছিল না, কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি সে বুকের মধ্যে অনুভব করিতেছিল ; কেবলি তার মনে হইতেছিল, সে যেন কি একটা হারাইতে বসিয়াছে।

সুভার আজ দুপুর বেলাকার ব্যবহারটার মধ্য হইতে সে এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, যে সেখানে তার আর এতটুকুও আদর নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে সুভাকে দেখিয়া আসিতেছে, শুধু দেখিয়া আসা নয়, ছেলেবেলা হইতে সে এই এত বড় গ্রামটার মধ্যে, এই একটি মাত্র জীব পাইয়াছিল যাহার নিকট সুখ দুঃখের, মনের প্রাণের সমস্ত কথা বলিয়া, সে নিশ্চিন্ত হইত এবং সে এটাও বেশ জানিত যে, তাহাকে না হইলেও সুভার একদণ্ড চলে না। এই গর্ব্বের কথাটা সে পরের কাছে এবং নিজের কাছে, মনে মনে এবং প্রকাশ্যভাবে কতবার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু আজ সে হঠাৎ কেমন করিয়া যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে, যে তার এই গৌরবের আসনটি আজ আর তার অধিকারে নাই—আর একজন আসিয়া সেটাকে দখল করিয়া বসিয়াছে ;—একথা যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল এবং এই অনধিকারী লোকটার উপর তার ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল,—এ যেন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

১০

সন্ধ্যার সময় শুঁড়িখানার একটা কোণে, দেয়াল ঠেস দিয়া লালু চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল—তার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি হইতেছিল এবং একটা ঠাণ্ডা জোলোবাতাস এলোমেলোভাবে আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

ঘরের মধ্যে প্রায় সাত আট জন মাতাল একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া খুব খানিকটা হল্লাহল্লি করিতেছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে কিছুদূরে, একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া, একটি ভাবুক মাতাল অত্যন্ত তন্ময় হইয়া, ঘাড় মুখ নাড়িয়া এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া, সুর টানিয়া টানিয়া দেহতত্ত্ব গাহিতেছিল।

হঠাৎ সেই মাতালের দলটার ভিতর হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "নেলো শালা যে আজ বড় সাধু সেজে বসে রয়েছে —ব্যাপারখানা কি বল্‌ত ? আরে এই সম্বন্ধির-পো! আমোলো! শালা মুখখানা করে বসে আছে দ্যাখ একবার!" কথাটা শেষ করিয়াই লোকটা টলিতে টলিতে গিয়া লালুর ঘাড়ের উপর পড়িল এবং তার গলাটাকে খুব জোরে জড়াইয়া ধরিয়া, গালে খুব জোরে একটা চুমা খাইয়া বলিয়া উঠিল, "তোর মাগ মরেছে,

নাকি রে শালা, তাই বিধবার মত নিরমিস্ বসে আছিস এখানে, ওঠ শিগ্‌গির বলছি, এমন বাদলার দিনে শালা কিনা মুখখানাকে সিঁটকে বসে আছে!—ব্যাটার আক্কেলটা দ্যাখ দেখি একবার।”

“আঃ, কি করছিস্ কুঞ্জ, ছেড়ে দে বলছি মাইরি—শরীরটা আজ ভাল নেই—বড্ড মাথা ধরেছে,” বলিয়া লালু উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওঃ বাবা, এ যে আবার মান করে রে!” কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টুলে উপবিষ্ট সেই ভাবুক লোকটি হঠাৎ দেহতত্ত্ব থামাইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, ঢং করিয়া মানভঞ্জনের পালা সুরু করিয়া দিল এবং বেঞ্চের উপরকার শ্রোতাগুলি বিকট চীৎকার করিয়া বাহবা দিয়া উঠিল।

অত্যন্ত বিরক্তভাবে লালু বলিয়া উঠিল, “কি যে ইয়ারকি করিস কুঞ্জ, মাইরি বলছি ভালো লাগছে না, শরীরটা বড্ড আজ খারাপ রয়েছে।”

দুহাতে তার কাণ দুটা বাগাইয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে কুঞ্জ বলিয়া উঠিল, “শরীর খারাপ হয়েছে, তাতে ফূর্ত্তি করতে বাধাটা কি রে শালা! এই ত সেদিন, বিশ্বাস না হয় বেনোয়ারীকে ডেকে বরং জিজ্ঞেসা করে দ্যাখ্, কি রকম জ্বর গা—একবারে পুড়ে যাচ্ছে, সকলে বল্লে, ঘুমো একটু! আমি বল্লুম, কুছ্ পরোয়া নেই—যায় প্রাণ ভিজে যেগে খাবো—ভয় কিসের রে বাবা! সেই

অর-গা নিয়ে কি ফূর্ত্তিটাই না করলুম—হাঁ এই ত ফূর্ত্তি! তা নয়, আজ শরীর খারাপ, কাল মন ভাল নেই—ঐ জন্যেই ত তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে যায় না; শালা যেন কিম্ভুৎ-কিমাকার! না বাবা, ওসব কোন কথা শুনছি না, তোকে আজ ফূর্ত্তি করতেই হবে! মাইবি বলছি নেলো, অধর্ম্ম হবে তা না হলে।"

হঠাৎ কি মনে করিয়া নেলো বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ফূর্ত্তি করছি—কি করতে হবে তাই বল্!"

"এইত বাবা—পদে এস না—গোমড়া মুখ করে বসে থাকলে কি ভাল দেখায় চাঁদ!" কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লালু হঠাৎ অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে ঘরের মধ্যে লাফালাফি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং বিকট চীৎকার করিয়া, একটা অতিবড অশ্লীল গান, নানাপ্রকার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া গাহিতে সুরু করিয়া দিল। সকলে 'কেয়াবাৎ-বাইজী', বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে নাচ গান লাফালাফি করিয়া, হঠাৎ একসময় লালু বলিয়া উঠিল, "তোরা সব ফূর্ত্তি কর, আমি এখুনি আসছি।" কুঞ্জ চীৎকার করিয়া উঠিল, "না বাবা, তা হচ্ছে না, —তুমি সরবার মৎলব কচ্ছ, সেটি হচ্ছে না চাঁদ!"

"নারে শালা না, তোরা আমার আটকিয়ে রেখে দেনা, আমি

বোঁ করে একটা কাজ সেরে এসে আবার যোগ দিচ্ছি, এই ছাখ না," বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে বোঁ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বৃষ্টি প্রায থামিয়া আসিয়াছিল, লালু অন্ধকারে ধীরে ধীরে খালের পোলটার ধারেই, জলের কিনারায় সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা যে পিল্লেটা আছে, তাহারি উপর আসিয়া নীরবে বসিয়া পড়িল। তার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সেই যে কালো কুৎসিত মেয়েটার ঘরে সে আজ তিন দিন হইল হঠাৎ গিয়া উঠিয়াছিল, তারপর হইতে সে সেই মেযেটার আর কোনরূপ খোঁজ খবর রাখে নাই—ইচ্ছা করিয়াই। তার কেমন যেন একটা ভয় হইয়া গিয়াছিল। সে ত কতবার কত স্ত্রীলোকের ঘরে গিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ফুর্ত্তি করিয়া চলিয়া আসিবার পর তাদের কথা ত তার মনের মধ্যে একবারও জাগিয়া উঠে নাই! যতক্ষণ ফুর্ত্তি করা ততক্ষণই কেবল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, তারপর আবার যেকে সেই; কোনরূপ বন্ধন নেই—কিছু নেই—আজ এখানে কাল সেখানে, পরশু আর এক স্ত্রীলোকের বাড়ী, তরশু আর এক জায়গায়, বেশ দিব্য নিশ্চিন্তভাবে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, কোথাও কোন বাঁধাবাঁধি নেই, নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, কিছু নেই,—দিব্য বেপরোয়া ভাসিয়া চলা, কিন্তু সেদিন সেই স্ত্রীলোকটার ঘরে গিয়া অবধি লালু যেন

কেমন একটা ভার-বোঝা বুকের মধ্যে অনুভব করিতেছিল। তাকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না—কোন মতেই না এবং যতই সে তাকে ভুলিতে পারিতেছিল না, ততই একটা অসোয়াস্তি তার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। এই তিনদিনের মধ্যে কতবার তার ইচ্ছা হইয়াছে, একবার গিয়া তাকে দেখিয়া আসে—একটু আধটু ইচ্ছা নয়—প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু সে যায় নাই—যাইতে সাহস করে নাই, তার বুকের ভিতর সর্ব্বদাই কেমন যেন একটা ভয় হইতে থাকে, মনে হইতে থাকে, যেন অতি বড় সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু সে করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে এবং কোনও গতিকে এটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে না পারিলে যেন তার আর মুক্তি নেই। চুপ করিয়া বসিয়া বাসয়া লালু এই একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনের মধ্যে পাকাইয়া তুলিতেছিল। এতক্ষণ ধরিয়া একটিমাত্র চিন্তা লইয়া তার মন আজ পর্য্যন্ত কোনদিন এমন ভাবে ত পড়িয়া থাকে নাই—এ যেন তাব কাছে নেহাতই বেখাপ্পা ঠেকিতেছিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া লালু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সুঁড়িখানাব মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মাতালের দল তখন নাচ গান বন্ধ করিয়া নিঝঝুম হইয়া পড়িয়াছে। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, লালু তাহাদের মধ্যে একজনকে এক ঠেলা মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে আট-

আনা পয়সা দিতে পারিস কুঞ্জ, কালই ফিরিয়ে দোবো মাইরি। বড্ড দরকার, না হলেই নয়!"

চোখ কচলাইয়া উঠিয়া বসিয়া, কুঞ্জ বলিল, "তুমি কি বাবা মেয়েমানুষ—যে পয়সা দোবো?"

"এই বুঝি তুই আমাকে ভালো বাসিস?—আচ্ছা বাবা মনে রইলো," বলিয়া লালু দাঁড়াইতেই সে বলিয়া উঠিল, "রাগ করিসনে মাইরি—আমি তোকে সত্যি সত্যি বড্ড ভালো বাসি—এই নে পকেটে যা কিছু আছে সব ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে যা, কিছু বলব না, কি সামান্য পয়সার কথা বলছিস নেলো, দরকার হয় ত এখুনি তোর জন্যে পৈতৃক প্রাণটা পর্য্যন্ত হাসতে হাসতে দিয়ে দিতে পারি—তা জানিস্!—কিন্তু একটা চুমো দিতে হবে!" তারপর হঠাৎ ষাঁড়ের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, "দূর শালা, দাড়ী কামাতে পারিস্ না?" বলিয়া পকেট হইতে একটা টাকা এবং কিছু রেজকি বাহির করিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া দিয়া, বলিয়া উঠিল, "নে শালা, শিগ্‌গির দাড়ি কামিয়ে আয় বলছি—তা না হলে খুন করে ফেলবো একবারে—শিগ্‌গির বলছি—" এই অবধি বলিয়াই—সে দেয়ালে ঠেস দিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

টাকা এবং পয়সাগুলো ট্যাঁকে গুঁজিয়া, লালু আবার রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং ছুটিতে ছুটিতে কাছে-পিঠের একটা

খোলারঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া, একটা ঘরের দরজায় খুব জোরে জোরে ঘা দিয়া ডাকিতে সুরু করিয়া দিল, "কামিনী ঘরে আছিস্?--কামিনী!" ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কে অ লালু?—ঘরে লোক রয়েছে এখন—একটু ঘুরে আয় ছোঁড়া!"

"তবে মরগে যা,—আমি অন্যত্তরে চেষ্টা দেখিগে," বলিয়া লালু সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের আর একটা খোলার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া, একটা কালো মাগীকে সুমুখে দেখিয়া, বলিয়া উঠিল, "আরে, তুই কবে ফিরে এলিরে ছুঁড়ি?"

সে একগাল হাসিয়া, চোখ ঠারিয়া উত্তর দিল, "এতদিনে বুঝি বাবুর খোঁজ নেবার সময় হোলো?—আমি বুঝি আজ ফিরেছি?"

"তবে?"

"আজ তিনমাস হোলো ফিরে এসেছি।"

"বটে!—তাত আমি জানতুম না—তা বেশ হয়েছে,—আমি এই মাত্তর ভাবছিলুম, কোথায় যাই—কি করি?—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই সেই কালো মাগিটা, তার ভাঙ্গা কাঁসির মত খ্যান্ খ্যানে গলায় বলিয়া উঠিল, "ঐ সুমুখের ঘরে গিয়ে বস্‌গে—আমি এখুনি যাচ্ছি!"

অনেক রাত পর্য্যন্ত সেই মাগীটার ঘরে হল্লাহল্লি চীৎকার

নমস্কার করিয়াও লালুর মন একটুও খালি হইল না, সে ঢুকিয়াছিল যে মন লইয়া, সেই মন লইযাই আবার পথে বাহির হইয়া আসিল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে আবার সেই খালের ধারের ইটের ঢিপিটার উপর গিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল; কিছুতেই আজ সে যেন সুস্থির হইতে পারিতেছে না। হঠাৎ এক সময় "তুত্তর" বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে সুঁড়োর পথ ধরিয়া বরাবর পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নির্জ্জন অন্ধকার পথ, বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু আবার এক পশলা নামিবার সম্ভাবনা আকাশে বাতাসে বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল। লালু অনেকটা পথ উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিয়া আসিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া ফিরিল এবং খালের ধারে ফিরিয়া আসিয়া, আবার সেই ঢিপিটার উপর অত্যন্ত বিরক্তভাবে বসিয়া পড়িল। তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে। কিছুক্ষণ নির্ব্বিকার ভাবে ভিজিয়া, কি মনে করিয়া লালু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং খালের ধারের চওড়া পথটা ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুদূর এই ভাবে চলিয়া হঠাৎ একস্থানে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পথের এপার হইতে ওপারের দিকে চাহিয়া সে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেদিনকার সেই সরু গলিটার ধারে সেই মেয়েটা ঠিক তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সে একবার ফিরিবার চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ একছুটে সেই মেয়েটার কাছে আসিয়াই, অত্যন্ত বেখাপ্পাভাবে বলিয়া উঠিল, "ওঃ ভুল করেছি, তুমি সে নও!" স্ত্রীলোকটা চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "কেন আমাকে কি পছন্দ হচ্ছে না?" "না, না, পছন্দ অপছন্দর কথা হচ্ছে না,—আমি আর একজন মেয়েমানুষকে খুঁজছি।"

স্ত্রীলোকটা গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বেশ তো, সে ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না গো!—আজ না হয় আমারি ঘরে গিয়ে উঠলে!"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া লালু ঝড়ের বেগে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

এই সময় বৃষ্টিটাও একটু ঝাঁকিয়া আসিয়াছিল, লালু ছুটিতে ছুটীতে একটা বড় বাড়ীর বারান্দার তলায় আসিয়া রকের উপর উপু হইয়া বসিল। তার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই সেই মেয়েটার ঘরে এতক্ষণ অন্য কোন লোক আসিয়া জুটিয়াছে—তাই সে আজ আর পথে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, এতক্ষণে হয়ত!—লালুর মনটা হঠাৎ কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, এ চিন্তাটা তার আদবেই ভাল লাগিল না, এবং যতই সে একথাটা লইয়া মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল, ততই তার বুকটার ভিতর কেমন যেন ধড়্ ধড়্ করিয়া উঠিতে

লাগিল। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—একি মুস্কিল!—আসুক না অন্যলোক এই স্ত্রীলোকটার ঘরে—তাতে তার কি আসে যায়?—বিরক্তভাবে লালু সেই রকটার উপর শুইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে আপনার এলোমেলো কোঁচাটাকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া ফেলিল।—হঠাৎ কে জানে কেন, আজ তার নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সে উঠিয়া পড়িল এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেই সরু গলিটার নিকট আসিয়া আবার উপস্থিত হইল। মুখরা সেই স্ত্রীলোকটা, বৃষ্টি হইতে দেহটাকে বাঁচাইবার জন্য তখন গলির মোড়ের একটা খোলার ঘরের ছেঁচতলায় গুঁড়িসুঁড়ি মারিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—লালুকে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, "কেন মিছে ঘুরে মরছ বাবু,—আমরা কি আর আদর যত্ন জানি না, আজ দুদিনই না হয় রাস্তায় দাঁড়িয়েছি—তা না হলে, চিরকালই ত বাঁধা ছিলুম গো,—আমরা অমন যাকে তাকে—"

সে কথায় কাণ না দিয়া লালু বেগে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সেদিনকার সেই ভাঙ্গা চালা ঘরটার দ্বারে আঘাত করিতে করিতে ডাকিল, "দরজাটা খুলে দাও!"—তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

ভিতর হইতে মোটা পুরুষকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কে?—কি চাও?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লালু বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক্‌গে—"

ভিতর হইতে আবার পুরুষকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কি চাই—তাই বল না?"

সে বলিল, "কিছু না।"

"তবে কি এখানে ছলনা করতে এসেছ বাবা?" বলিয়া লোকটা ভিতর হইতে বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং অত্যন্ত অশ্রাব্য ভাষায় লালুকে উদ্দেশ্য করিয়া গুটিকতক বাছা বাছা রসিকতা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

লালু আবার গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বৃষ্টির বেগটা তখন কমিয়া আসিয়াছিল, সে গলির মোড়ের কাছ বরাবর আসিতেই সেই মুখরা স্ত্রীলোকটা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবুর বুঝি কাউকে পছন্দ হচ্ছে না, কি কন্দর্প পুরুষই এসেছেন আমার। মরি মরি, ন্যাওড়াতলার নবকার্ত্তিক আর কি?" কথাটা বলিবার সময় সে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল। পাশেই একটা পানের দোকানের সুমুখে দাঁড়াইয়া গোটাকতক বকাটে ছোঁড়া জটলা করিতেছিল, হো হো শব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "সাবাস্ বঙ্কেকালীর বাচ্ছা, বেশ হচ্ছে বাবা!—এঙ্কোর এঙ্কোর।"

কোন দিকে কাণ না দিয়া লালু আবার খালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ খালের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার কি মনে করিয়া সেই গলিটার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বাচাল স্ত্রীলোকটা তখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেই গলির মোড়টার মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে গলিটার ভিতর প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বেকার সেই দরজাটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কবাটে টোকা মারিয়া ডাকিল, "দরজা খুলে দাও।"

ভিতর হইতে এবার স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল "কে?"

"আমি! সেদিনকার সেই লোক, যে তোমাকে টাকা দিয়ে গেছল।" ভিতর হইতে বিরক্তিজড়িতকণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি কারুর কাছে টাকা কড়ি ধার করিনি বাপু, তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ—পাশের বাড়ী দেখ।—"

অত্যন্ত উত্তেজিতকণ্ঠে লালু বলিয়া উঠিল, "না, না, টাকা ধার করতে যাবে কেন তুমি, আমি তোমাকে ইচ্ছে করেই সে টাকা দিয়ে গেছলুম—ধার বলে নয়, দরজাটা খুলেই দাও না একবার, —বুঝতে পারবে অখন: তোমার ঘরে কি এখনও লোক আছে?"

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "আপনিই বুঝি কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন?—তখন আমার ঘরে লোক ছিল, আপনি কি চান এখানে?"

"খুলে দাও না আগে, তার পর বলছি সব," বলিয়া লালু আবার দরজায় ঘা দিল—তাব বুকের ভিতরটা দুর দুর করিতেছিল। "কি দরকার না বল্লে আমরা যাকে তাকে অমন দরজা খুলে দিই না।" অত্যন্ত বিরক্তভাবে লালু বলিয়া উঠিল, "মনে নেই, আজ তিন দিন আগে, তোমাব ঘবে এসেছিলুম, তোমার তখন জ্বর হয়েছিল—আমি তোমাকে টাকা দিয়ে গেলুম।"

ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটা ছিট্‌কাইয়া উঠিল, "মাতলামী করবার আর জায়গা পাস্‌নে—আচ্ছা হারামজাদা মিন্‌সে ত!—ফের যদি চেঁচাবি ত বেবিয়ে গিয়ে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো বলছি।"

তথাপি লালু ডাকিল, "একবারটি দোর খুলে দাও—আমাকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে।" তার গলার স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিষাদময়।

হঠাৎ ঝনাৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোট কেরাসিনের ডিবে হাতে লইয়া, একটা মোটা কালো মাগী বাহির হইয়া আসিয়া লালুব মুখের কাছে আলোটা একবাব উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াই, ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আমার সাত—পুরুষের গুরুঠাকুর এসেছেন—তাই ওঁকে দেখলেই চিনে ফেলবো—মুখ্যে আগুন আর কি! ন্যাকড়া করবার আর যায়গা পায়নি, তাই মরতে—।"

হতভম্বের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় সেই স্ত্রীলোকটার হাতে কুঞ্জপ্রদত্ত সেই আধুলিটা গুঁজিয়া দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "আমি ভুল করে ফেলেছি, তা বেশ ত, তার জন্যে গুণগার দিচ্ছি—তাহলেই হবে ত!"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই আধুলিটা হাতে পাইয়া স্বরটাকে নামাইয়া লইয়া, স্ত্রীলোকটা বলিয়া উঠিল, "তা আগে থেকে সে কথা বল্লেই ত হোতো বাবু, তাই বলি টাকার কথা কি বলছে—আমি ত কারুর কাছে টাকা কড়ি ধার করিনি," তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও হরি, এতক্ষণে সব বুঝিছি, তুমি বুঝি তিন চার দিন আগে এই ঘরে এসেছিলে?—তখন এঘরে হরিমতি থাকৃত বুঝি?"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে লালু বলিয়া উঠিল, "তার নাম আমি জানি না,—খুব রোগা, কালো, মুখে বোধ হয় বসন্তের দাগ আছে—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই স্ত্রীলোকটা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না, তুমি হরিমতির কথাই বলছ; তুমি তাকে টাকাকড়ি কিছু ধার দিয়েছিলে বুঝি?—তা বেশ করেছ!" বলিয়া সে অত্যন্ত বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল।

অত্যন্ত উত্তেজিতকণ্ঠে লালু বলিয়া উঠিল, "কেন? সে কি এ বাড়ী ছেড়ে গেছে?"

অত্যন্ত জোরে জোরে হাসিতে হাসিতে স্ত্রীলোকটা বলিয়া উঠিল, "শুধু এ বাড়ী নয়, এ পৃথিবীও সে ছেড়ে গেছে।"

অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে লালু চীৎকার করিয়া উঠিল, "কেন, সে কি মরে গেছে?—জ্বরে ভুগে?—না খেতে পেয়ে?"

চাপা হাসির স্বরে স্ত্রীলোকটা বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি তাকে ভালো বাসতে বড্ড?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া, লালু মাতালের মত টলিতে টলিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল এবং রাস্তার ধারের বারান্দার তলাকার সেই চ্যাটালো রকটার উপর আসিয়া, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল।

১১

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরঘরে বসিয়া সুভা পাটঝাট করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ঘরের মেঝের উপর কাহার কালো ছায়া আসিয়া পড়ায়, পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কেও শরৎ?—অমন চোরের মতন চুপি চুপি এসে কখন দাঁড়ালে ভাই?"

"এই এখুনি আসছি" বলিয়া শরৎ উপু হইয়া চৌকাঠের উপর বসিল।

পঙ্ক-প্রদীপটাকে একটা তেলধরা নেতা দিয়া মুছিয়া চক্‌চকে করিয়া তুলিতে তুলিতে সুভা বলিয়া উঠিল, "সে দিন কিন্তু আচ্ছা কেলেঙ্কারীটা করলে ভাই!—কোথাও কিছুই নেই, হঠাৎ সংএর মতন চলে গেলে কি বলে বলত?—বিমল-দা কি ভাবলেন বল দেখি!"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "বিমল-দা কি ভাবলে না ভাবলে,—সেই চিন্তায় তো আমার ঘুম হচ্ছে না!"

"এখন পর্য্যন্ত তোমার রাগ যায়নি দেখছি, আচ্ছা ছেলেমানুষ ত! সত্যি সত্যি, তোমার এ ছেলেমানুষী কি চিরকালই থাকবে?"

অত্যন্ত করুণকণ্ঠে শরৎ বলিয়া উঠিল, "আমি বুঝি সাধে সেদিন রাগ করলুম সুভাদি?—তুমি আমার কবিতা নিয়ে কতদিন কত ঠাট্টা করেছ ত, কৈ কোন দিন আমাকে রাগ করতে দেখেছ?" এই অবধি বলিয়া শরৎ একটা ঢোঁক গিলিয়া লইল এবং তারপর আবার আরম্ভ করিল, "তুমি আড়ালে আমাকে যা খুসী বল না, তাতে আমার একটুও রাগ হয় না সুভাদি, কিন্তু আর একজন বাইরের লোকের সামনে তুমি আমাকে অমন করে অপদস্ত করলে, আমার বড্ড রাগ হয়;

সত্যি বলছি সুভাদি, আমি সেদিন রাত্তিরে কিচ্ছু খাইনি, সারারাত কেবলি কান্না আসছিল।"

স্নেহজড়িতকণ্ঠে সুভা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা পাগলা ছেলে ত, আমি বুঝি রাস্তার লোক ধরে ধরে তোমার নিন্দে করতে গেছি? —কেবল বিমল-দার কাছে—তাও কি এমন অপদস্তটা করেছি শরৎ?"

মেঝের উপর একটা খোলামকুচি লইয়া হিজিবিজি কাটিতে কাটিতে শরৎ বলিল, "তুমি যতই বল সুভাদি, বিমল-দা তোমাদের যতই আপনার লোক হোক্ না কেন, তাই বলে আমার চেয়ে আপনার কক্ষণই না, ঠিক করে বল দেখি সুভাদি?—না হেসো না।—আমার বড্ড রাগ হচ্ছে কিন্তু, তুমি বুকে হাত দিয়ে বল দেখি সুভাদি, এই ঠাকুর ঘরে বসে— আমার চেয়ে বিমল-দা তোমাকে বেশী ভাল বাসে?—সে কথা আর কাউকে বলতে হয় না।—চুপ করে রইলে যে?—বল না!—বল!"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "কি পাগলের মতন বক্‌ছ শরৎ—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?"

অত্যন্ত জোরে জোরে মাথাটাকে নাড়া দিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "না, না, ঐ বলে কথা কাটালে চলবে না সুভাদি,— তোমাকে বলতেই হবে!—তুমি আমাকে হাজারবার ঠাট্টা

করনা. সে তোমাতে আমাতে বুঝবো, কিন্তু তাই বলে, বিমলদার কাছে তুমি আমাকে ছোট করতে গেলে কেন,—তাইতে তো রাগ করলুম, যেন বিমল-দা আমার চেয়ে তোমার আপনার লোক, তাই তাকে বাড়িয়ে আমাকে ছোট করতে গেলে !"

কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়াই বিরক্তভাবে সুভা বলিয়া উঠিল, "বেশ ত, ঘাট হয়েছে, আর কখন অমন বাজে হবে না—তা হলেই হোলো ত ?"

ইহার উপর শরৎ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না,—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুভা নিজেই আরম্ভ করিল, "তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কতদিনে হবে বল দেখি শরৎ—তুমি কি চিরকালই—"

কথাটাকে মাঝখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "এবার থেকে মনে করছি কবিতা লেখা ছেড়ে দোবো সুভা-দি !

"হঠাৎ এ আবার কোন্ দেশী খেয়াল শুনি ?"

"খেয়াল নয় সুভা-দি—,সত্যি সত্যি এবার থেকে গল্প লিখবো ঠিক করেছি, বোসোনা, আমিও এবার থেকে কাজের লোক হচ্ছি !"

চাপা হাসির বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুভা বলিয়া উঠিল,—"না, এইবারে তুমি সত্যি সত্যিই হাসালে দেখছি !"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বিমলদার ওপর তোমার এত হিংসে কেন, বল দেখি শরৎ ?"

জোর করিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "হিংসে ?—হিংসে হতে যাবে কেন ? আচ্ছা লোক ত তুমি যাহোক্ ! বিমলদা এমনই বা কি বড়লোক যে তাকে আমি হিংসে করতে যাবো ! হুঁ, হিংসে আবার কখন করলুম—বা রে ! তুমি ত আচ্ছা মজার লোক যাহোক !"

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাদের সিঁড়িতে খড়মের শব্দ পাওয়া গেল। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল,—"জ্যাঠাবাবু আসছেন বুঝি ?—আজ বেশ আরতি দেখা যাবে !"

সঙ্গে সঙ্গেই হরিশঙ্কর ছাদের উপর উঠিয়া আসিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "কে কার হিংসে করছে রে শরৎ ?"

"না, ও কিছু না।" বলিয়া শরৎ ঘাড় চুলকাইয়া দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কুশাসনের উপর বসিয়া, হরিশঙ্কর আবার আরম্ভ করিলেন, "তবে কি ওটা একটা রূপক্ টুপক্ হচ্ছিল নাকি ? চাঁদ বুঝি তোর কবিতার নায়িকার মুখের হিংসে করছে ?—যাহোক কবি হয়ে উঠেছিস্ কিন্তু তুই !—একেবারে কালিদাসকেও ছাপিয়ে উঠ্‌লি দেখছি।"

একটু হাসিয়া শুভা বলিল, ওর আমার ওপর রাগ হয়েছে ;

বিমল-দার কাছে ওর কবিতা লেখা নিয়ে ঠাট্টা করেছি—এই হয়েছে ওর রাগ, বলে, "তুমি আড়ালে আমাকে যা'ইচ্ছে তাই বল না, কিন্তু অপর একজন লোকের কাছে কেন অপদস্থ করলে ?'

"আরে পাগলা, ওরা ঠাট্টা করলে ত বড় বয়েই গেল, বড় বড় কবিকে প্রথম প্রথম ওরকম অনেক ঠাট্টা সহ্য করতে হয়, অতব দরকার কি, এই ত তোদের রবিঠাকুর এত বড় কবি হয়েছেন, আমাদের সময় ঐ রবিবাবুকে কাব্যবিশারদ কি টিট্‌কিরিটাই না মেরেছিল।—তুইও বল না, যখন বিলেত থেকে রবিঠাকুরের মতন নোবেল প্রাইজটা ঘাড়ে করে এনে হাজির হবো তখন দেখা যাবে, কে কাকে ঠাট্টা করে।"

ঘাড় চুলকাইয়া, হাত কচলাইয়া শরৎ বলিল, "আপনারা খালি খালি আমাকে ঠাট্টা করেন, আমি ত বলছি, কবিতা লেখা ছেড়ে দেবো এবার থেকে।"

"ঐ দেখছো বাবা, ও আমার ওপর কি রকম রেগে রয়েছে এখন পর্য্যন্ত,—বলে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে গদ্য লিখবো।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, হরিশঙ্কর বলিলেন, "তবেই হয়েছে, কবিতা তবু ধৈর্য্য ধরে শোনা যায়, আর কিছুর জন্যে না হোক্ অন্ততঃ আকারে ছোট বলে, দুচার কথায় শেষ হয়ে যায়, এর ওপর আবার যদি গদ্য লিখতে আরম্ভ কর, তাহলেই গেছি

আর কি!—দোহাই তোর শরৎ, ঐ কাব্য লিখছিস্ ঐ বেশ হচ্ছে—আর গদ্যে কাজ নেই বাবা!"

শরৎ এ কথার আর কোন জবাব দিল না।

আরতি আরম্ভ হইল, পঞ্চপ্রদীপ মণ্ডলাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, হরিশঙ্কর ঘণ্টা নাড়িয়া আরতি করিতে লাগিলেন, আর কিছু দূরে গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া, ভক্তি গদ্‌গদ ভাবে সুভা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুভার এই হাত জোড় করিয়া, ভক্তি-নত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকার ভঙ্গীটি শরতের আজ বড্ড ভাল লাগিল। সে আরতি দেখিল না, ঠাকুর দেখিল না, কেবল চুপ করিয়া একদৃষ্টে সুভার সেই ভক্তি গদ্‌গদ্ সুন্দর মুখখানির দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আরতি শেষ হইয়া যাইতেই সুভা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রাণপাত করিল, তাব দেখাদেখি শরৎও হেট হইয়া একটা প্রণাম করিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরিশঙ্কর খড়ম পায়ে খটাস্ খটাস্ শব্দ করিতে করিতে ছাদ হইতে নিচে নামিয়া গেলে পর, সুভা ঠাকুরঘরের শিকলটা টানিয়া দিয়া, অন্ধকার ছাদের উপর আসিয়া বসিল। শরৎ বসিল না, সে ততোধিক অন্যমনস্কভাবে ছাদময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুইজনেই নীরব, কাহারও মুখে একটি কথা নাই; হঠাৎ এক সময় কি মনে করিয়া নিকটে আসিয়া বসিয়া, শরৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সুভাদি, এক কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ শুনি।"

"তোমাদের ভেতরের উঠোনটা ত বেশ লম্বা চওড়া আছে, ঐখানে গোটাকতক বেঞ্চি পেতে দিয়ে, ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল খুল্লে হয় না?—আমি ছেলেদের পড়াবো, আর তুমি পড়াবে মেয়েদের,—তা হলে কিন্তু বেশ হয়—নয় সুভাদি? বেশ তোমাতে আমাতে মিলে মিশে ইস্কুলটাকে চালাবো—।"

একটু ভাবিয়া সুভা বলিল,—"তা মন্দ হয় না শরৎ।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া, শরৎ বলিল, "দেশের কাজ আমরাও বুঝি করতে পারি না।—কি বল সুভাদি? শুধু বুঝি খদ্দর গায়ে দিয়ে, বক্তৃতা করে বেড়ালেই দেশের কাজ হয়।"

সে কথা কানে না তুলিয়াই সুভা বলিয়া উঠিল, "না, এ মন্দ কাজ নয়,—আচ্ছা বিমল-দা বাড়ী ফিরে আসুক, কথাটা পেড়ে দেখি, তুমি তা'হলে এখন থেকে—বিমল-দার আসা অবধি অপেক্ষা কর।"

এক কড়া দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলিয়া দিলে সমস্ত দুধটা যেমন দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়, ঠিক তেমনি করিয়া এই একটিমাত্র কথায় শরতের এত কষ্টে সঞ্চিত সমস্ত উৎসাহ এক

নিমিষে কোথায় উড়িয়া গেল; সে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিমলদার এ সব করবার কি সময় থাকবে সুভাদি?—তিনি ত নানান্ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন; আমি বলি কি, তার চেয়ে এসনা—তোমাতে আমাতে এ কাজটায় লেগে পড়ি, আর তাছাড়া, এতে বেশী লোকের ত দরকার হবে না, সুভাদি!"

"হাজার হোক্ তুমি ছেলেমানুষ, আর আমি হচ্ছি মেয়েমানুষ, মাথার ওপর একজন কেউ থাকলে ভাল হয় না?—আর তাছাড়া, এ সব কাজ বিমল-দা যেমন বুঝবে—তেমন কি আর তুমি আমি বুঝবো শরৎ?"

বাধা দিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি দেখ না সুভাদি, আমি একাই সব করে ফেলব, এ আর শক্ত কাজটা কি! অবশ্য বিমল-দাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, কর; কিন্তু আমার মনে হয়—কোন দরকার নেই; কেন?—বিমল দা ছাড়া কি আমরা নিজেরা একটা কাজও করতে পারি না?—ঐ করে করেই ত আমরা মাটি হয়ে গেছি—নিজেদের ওপর একটু বিশ্বাস নেই, যেন আমরা—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে বিমল ডাকিল, "সুভা!—আমার ঘরের চাবিটা কি তোমার কাছে?"

"মজাটা দ্যাখ না শরৎ!" বলিয়া হঠাৎ গলার স্বরটাকে-

গম্ভীর করিয়া তুলিয়া, সুভা বলিয়া উঠিল, "আপনার চাবি আমি কি করে জানবো বলুন !"

"কেন দুষ্টুমি কর সুভা ! নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে, আমি বোধ হয় ভুলে কোথাও ফেলে গেছি—তুমি নিশ্চয়ই কুড়িয়ে রেখেছ," বলিতে বলিতে বিমল ছাদের উপর উঠিয়া আসিল।

আপনার চাবি ত আপনার কাছেই থাকে, দেখুন পকেটে টকেটে কোথাও নিশ্চয়ই আছে" কথাটা শেষ করিয়াই সুভা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

"কেন চালাকি কর সুভা, আমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি, তুমি লুকিয়ে রেখেছ।"

হঠাৎ কাপড়ের খুঁট হইতে একটা চাবি খুলিয়া লইয়া, ঝনাৎ করিয়া ছাদের উপর ফেলিয়া দিয়া, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত সুভা বলিল, "এবারটা নেহাৎ দয়া করে দিলুম, আর কখন কিন্তু এমন করে যেখানে সেখানে ফেলে গেলে, ফেরত দোবো না,—এ আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা. তাই হবে এখন," বলিয়া বিমল ছাদের উপর উপু হইয়া বসিয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "শরতের মুখে যে আজ বড় কথা নেই, তুমি চটিয়ে দিয়েছ বুঝি ?"

"চটাতে যাবো কেন, ও এখন বসে বসে কত চিন্তাই করছে।"

"কাব্য টাব্য নাকি ?" বলিয়া বিমল শরতের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

"না, না, সত্যি সত্যি বিমলদা, শরৎ আজ একটা ভারি চমৎকার কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।"

"কি কাজটা শুনি !"

"ও বলে, আমাদের ভেতরের উঠোনটাতে একটা মেয়ে-ইস্কুল খুল্লে হয় না ? আমার কিন্তু এটা বেশ ভাল লাগছে বিমল-দা।"

"তা মন্দ কি, বেশ ত, তুমি মাষ্টারণী হবে এখন, আর বাইরের উঠোনটাতে একটা ছেলেদের ইস্কুল খোলা যাবে—তাতে আমরা না হয় মাষ্টারী করবো—কি বল শরৎ," বলিয়া বিমল শরতকে নিজের কাছে ঘেঁসিয়া টানিয়া লইল।

শরৎ কোন কথা বলিল না—এ কাজে তার আর একটুও উৎসাহ ছিল না। তার মনে হইতেছিল কোনও গতিকে এখান হইতে পলাইতে পারিলেই সে বাঁচে।

তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বভা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ছেলে ত ! এই এতক্ষণ লাফালাফি করছিলে আর হঠাৎ সব থেমে গেল।—মাসিমা ঠিকই বলেন, এমন

খেয়ালে ছেলে আর দুটি নেই—কখন কি যে মাথায় আসে, তার ঠিক নেই—এখন আবার হয়ত অন্য কি একটা ভাবছে।”

উত্তরে শরৎ বলিল, “কেন কে জানে হঠাৎ মাথাটা বড্ড ধরে গেল সুভাদি, আমি বাড়ী চল্লুম, এই বেলা শুয়ে পড়িগে।”

“একটু গোলাপ জল এনে দেবো?” বলিয়া সুভা দাঁড়াইয়া উঠিল।

“না না, কিচ্ছু দরকার নেই,” বলিতে বলিতে শরৎ ছাদের সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল।

রান্না ঘরের ভিতর হইতে কিরণশশী ডাকিল, “কেও শরৎ—ঠাকুরপো না?”

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শরৎ উত্তর দিল, “হুঁ”

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, গলাটাকে নামাইয়া লইয়া, কিরণ বলিল, “এসব কোন্ দিশী কাণ্ড, বলত ঠাকুর পো?”

আরও গম্ভীরভাবে শরৎ বলিল, “কেন, কি হয়েছে?”

হাত [illegible] কিরণ বলিল, “[illegible] বড় সোমত্ত মেয়ে অন্ধকার ছাতে বসে বসে, একটা সাজুয়ান মিন্‌সের সঙ্গে ফুস্থুর ফুস্থুর গুজুর গুজুর করে, এটা কি ভাল কথা ঠাকুরপো? সত্যি কথা বলতে গেলেই সকলে চটে ওঠেন, কিন্তু তুমিই বলত ঠাকুরপো, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?”

শরৎ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—এতদিন ধরিয়া যেটাকে সে হয়ত মনে মনে অহোরাত্র অনুভব করিতেছিল, অথচ মনের কাছেও যার নালিশের ভাষাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না আজ সে যেন হঠাৎ কি করিয়া তাহারি একটা সাদাসিদে সোজা ভাষা খুঁজিয়া পাইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে বারবার আওড়াইতে লাগিল, "সুভাদি সোমত্ত মেয়ে, আর বিমলদা সোমত্ত ছেলে, অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়!"

তাহাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিরণ আবার বলিল, "এই দ্যাখো না ঠাকুর-পো, ভাগলপুর থেকে আজ তিন চার দিন চিঠি আসে নি, ভেবেই খুন হয়ে যাচ্ছি, ঠাকুরঝিকে গিয়ে বল্লুম—সে ত চটেই লাল!—আবার বলে কি জান ঠাকুর-পো? 'আমার সকল তাতেই বাড়াবাড়ি,—হুঁঃ, তোমার মতন ত আর—"!

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এখন তা'হলে যাই বৌদি—মাথাটা কড্ড ধরেছে," এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অনেক রাত্রে শরৎ বাড়ী ফিরিল। অন্নপূর্ণা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি গাঙ্গুলী-বাড়ী গেছলি আজ?"

"হুঁ"!

"তা হ্যাঁরে, বিমল সেই একটি দিন কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—আর আসে না কেন রে?—তাকে আমার নাম করে বলিস ত যে—"।

কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়াই শরৎ হঠাৎ অত্যন্ত বেখাপ্পা ভাবে বলিয়া উঠিল, "আসবার সময় পেলে ত আসবে?"

"কেন, সে কি আজ কাল বড্ড কাজে ব্যস্ত রয়েছে তাই—'

বাধা দিয়া শরৎ বলিয়া উঠিল, "তার কথা আর আমাকে জিজ্ঞেসা কোরো না মা। সুভাদির মত অতবড় সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে অন্ধকারে ছাতে বসে বসে—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই অন্নপূর্ণা অত্যন্ত গম্ভীর এবং কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ রকম নোংরা কথা বলতে তোকে কে শিখিয়েছে রে শরৎ? এ সব কথা ত তোর মুখে কোন দিন শুনিনি!"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়া শরৎ বলিল, "ও বাড়ীর বৌদিদি বলছিল তাইত—"

"খবরদার আর কখন এরকম কথা যেন তোর মুখ থেকে শুনতে না পাই!" বলিয়া শরতের মা হন্ হন্ করিয়া সেখান-হইতে চলিয়া গেলেন।

১২

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া, নিজের ঘরের তক্ত-পোষের উপর বসিয়া, বিমল কি একখানা চিঠি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিল, এমন সময় পিছন দিক হইতে স্বভা আসিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কার চিঠি বিমল-দা ?"

"বলছি, বোস," বলিয়া বিমল আবার চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং কিছুক্ষণ পর চিঠিপড়া শেষ করিয়া, বলিল, "এ হচ্ছে আমার একটি ছাত্রীর চিঠি।"

"ছাত্রী ? আপনি মেয়ে ইস্কুলের মাষ্টারী করতেন নাকি বিমল-দা ?"

একটু হাসিয়া বিমল বলিল, "না না এ সে রকম ছাত্রী নয়, এ হচ্ছে অন্য রকম ছাত্রী।" তারপর হঠাৎ খুব জোরে জোরে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "আমি তার শিক্ষাগুরু নই, একবারে যাকে বলে দীক্ষাগুরু, বুঝলে, বড় সোজা কথা নয় স্বভা !—তোমরাই যা আমাকে চিনলে না।" তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল, "আসল কথা, মেয়েটি আমাকে বড্ড শ্রদ্ধা করে।" কথাটা শেষ করিয়াই বিমল সামনের খোলা জানালাটা দিয়া বাহিরের দিকে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ সেই দিকে চাহিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "তোমার তার জন্য মন কেমন করে, নয় বিমল-দা ?"

"করে বৈকি, বিশেষ সন্ধ্যের সময়টাতে তার কথা বড্ড মনে পড়ে যায়. তার ও ঠিক ঐ একই অবস্থা, এই দেখ না, সে কি লিখছে, বলিয়া বিমল পত্রখানাকে সুভার দিকে আগাইয়া দিল "সমস্তটা পড়তে হবে না, শুধু ওপাতের শেষ কটা লাইন পড়লেই হবে, না না ওখানটা নয়, ওপাত উলটাও।—হ্যাঁ ঠিক ঐখান থেকে আরম্ভ।"

সুভা পড়িয়া যাইতে লাগিল :—"সমস্ত দিন একরকম করে কেটে যায়, কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে বড্ড মন কেমন করতে থাকে। আপনার কাজ কি এখনও শেষ হয়নি ?—না না সত্যি সত্যি কবে আসবেন বলুন। অবশ্য, জোর করে লিখতে পারছি না, কেন না একটা বড় কাজে হাত দিয়েছেন, নিজের একটু আধটু স্বার্থের জন্যে বাধা দেওয়া কখনই উচিত নয়। কিন্তু মানুষের মনটা ত আর শুধু বিবেচনা [illegible] শাস্ত্র মেনে [illegible] চিন্তা করে না, তার চিন্তা [illegible] বা। [illegible] নীতিশাস্ত্রের নিয়মাবলী মেনে চলে ও কোন কাজ হয় না। নয় ?"

এই অবধি পড়িয়াই সুভা চিঠিখানা তক্তপোষের উপর রাখিয়া দিল এবং হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ চিঠি লিখতে পারে ত, লেখা পড়া শিখেছে বুঝি ?"

একটু হাসিয়া বিমল বলিল, "একটু আধটু নয়, বেশ দস্তুর মত লেখা পড়া জানে, আমার মনে হয়, আজকালকার অনেক বি-এ, এম্-এর চেয়ে তার ঢের বেশী পড়াশুনো আছে, আর তাছাড়া তার মাথাটা যা সাফ, সত্যি সত্যি এমন চমৎকার মাথা আমি খুব কমই দেখিছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভা বলিল, "এ মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি করে আলাপ হোলো বিমল-দা?—এরা ব্রহ্মজ্ঞানী বুঝি?"

"ঠিক ব্রাহ্ম নয়—তবে ঠিক গোঁড়া হিন্দুও নয়—চালচলনটা অনেকটা ব্রাহ্ম ধরণের।"

"বয়েস কত?"

"তা সতেরো আঠারো হবে বোধ হয়, এই তোমাদের চেয়ে কিছু ছোটো হবে আর কি—বেশী নয়, দু এক বছরের," বলিয়া বিমল অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইল এবং হঠাৎ একটা অংশের প্রতি নজর পড়াতে একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "পাগলী মেয়ের রকম দ্যাখো না একবার!" কথাটা শেষ করিয়াই বিমল জোরে জোরে সেই অংশটা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল, "গুরুজীর তল্পী-তল্পাগুলির যে এতদিনে কি অবস্থা হয়েছে তা আমি অনেকবার কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু পারিনি, এখানে রোজ দুবেলা সেগুলোকে

গুছিয়ে রেখেও নিস্তার ছিল না. আব সেখানে—"। এই অবধি পড়িয়াই হঠাৎ থামিয়া গিয়া বিমল বলিয়া উঠিল. "কথাটা সে নেহাত মিথ্যে বলেনি, সত্যি সত্যিই সে বেচারা ছায়ার মতন আমার পেছনে পেছনে থাকতো, জান ত, আমি কি রকম ভুলো লোক, যেটি হারাতুম বা ফেলে যেতুম, অমনি সেটি সে তুলে রাখতো, আর ঐ যে তলপী-তলপার কথা লিখেছে, ওটা খুব সত্যি কথা, বেচারা রোজ এসে আমার খাতাপত্তরগুলি গুছিয়ে রেখে যেত আর আমিও রোজ সেগুলো ঘেঁটে ঘুঁটে একবারে একসা করে ফেলতুম।"

এই প্রসঙ্গটা, কেন কে জানে, সুভার একটুও ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু ভাল লাগিতেছিল না বলিয়াই সে হঠাৎ এ প্রসঙ্গটাকে বন্ধ করিতে পরিতেছিল না, তার ভয় হইতেছিল—পাছে তার এই সামান্য বিরক্তিটুকু বিমলের নিকট ফাঁস হইয়া পড়ে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসিয়া সুভা বলিল, "আপনি তাহলে তার গুরুদেব বলুন!"

"অনেকটা তাই বটে!"

"সেও বুঝি আপনার মতনই স্বদেশী?"

"ওঃ সে আবার আমার চেয়েও এককাটি সরেস," বলিয়াই হঠাৎ চিঠিখানাকে কুড়াইয়া লইয়া বিমল পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল, "না না হাসি নয়, যে করে পারি আমরা এইবার লোকের

দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাতে পায়ে ধরেও খদ্দর চালাতে চেষ্টা করবো, আমি কাল থেকে বেরোচ্ছি, ভদ্রলোকেদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লে তারা শুনবে না?—আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই শুনবে—আপনি কি বলেন?"

এই অবধি পড়িয়াই বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এমন চমৎকার মেয়ে আমি আর একটিও দেখিনি, সত্যি সুভা. তুমিও যদি তাকে একদিন দেখতে, তাহলে বোধ হয় ভাল না বেসে থাকতে পারতে না, যেমন সুন্দর স্বভাব. তেমনি উঁচু মন।"

"দেখতেও খুব সুন্দর নিশ্চয়ই।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সুভা মনে মনে কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল.

"দেখতে?—না দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, তবে চোখ দুটি—ওঃ ভারি চমৎকার, এমন চোখ বড় একটা দেখা যায় না," তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিয়া উঠিল, "দ্যাখ সুভা, আমার মনে হয়, মানুষের চোখ দুটোই মানুষের মনের কথা সব চেয়ে বেশী বলে দেয়—নয়? এই মেয়েটির চোখ দুটি দেখলেই মনে হয়, এর ভেতর কোন রকম সঙ্কীর্ণতা বা নীচতা থাকতেই পারে না।"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে হরিশঙ্কর ডাকিলেন, "সুভা!"

"এই যাই বাবা" বলিয়া সুভা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সেই রাত্রেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া শয্যায় শুইয়া সুভা এই অপরিচিতা শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মেয়েটার কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাবিতে লাগিল এবং যতই তার কথা সে ভাবিতে লাগিল ততই তার মনটা ভিতরে ভিতরে কেমন যেন দমিয়া যাইতে লাগিল।

এই মেয়েটার উপর, কে জানে কেন, সুভার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। তার চিঠি লেখার ভঙ্গীটা সুভার আদবেই ভাল লাগে নাই। একটা অবিবাহিতা সতের, আঠার বৎসরের সোমত্ত মেয়ে একজন তরুণ যুবককে এমন বিনাইয়া বিনাইয়া চিঠি লেখে, এটা তার কাছে কেমন যেন নেহাতই বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিমলকে সে শ্রদ্ধা করে, বেশ ত, সে ত ভাল কথাই, কিন্তু এই কি শ্রদ্ধার সুর?—এ যে নেহাতই একেবারে,—সুভার মনটা এই অপরিচিতা ব্রাহ্ম মেয়েটার উপর কেমন ভিতরে ভিতরে অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া, সুভা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। মাথার শিয়রের জানালাটা খোলা ছিল, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বাহিরের কালো পৃথিবীটার দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল এবং তারপর হঠাৎ এক সময় শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া, পাশ বালিসটাকে খুব জোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

পরদিন দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া, ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া স্নভা এবং স্নভার ভাজ কিরণশশি তেঁতুল ছাড়াইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে বিমল ডাকিয়া উঠিল, "এদিকে একবার শুনে যাবে স্নভা ?"

"যাই," বলিয়া বঁটিটাকে কাত করিয়া শুয়াইয়া রাখিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্নভা বলিল, "কেন বিমল দা ?"

"আমাকে কদিনের জন্যে একবার কলকাতায় যেতে হচ্ছে স্নভা !"

"কেন ?"

"মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আসছেন, খুব বড় একটা সভা, আমাকে সেই সভায় উপস্থিত থাকতে হবে কিনা !"

"ওঃ, তা কতদিনে ফিরছেন ?"

"বেশী দিন নয়—বড় জোর ছ, সাত দিন,—হয়ত তার আগেও ফিরে আসতে পারি। কেন ?—আমার ছাত্রীটির মতন তোমারও মন কেমন করবে নাকি ?" বলিয়া বিমল অত্যন্ত সরলভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ কথাটাকে উল্টাইয়া লইয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে স্নভা বলিল, "খুব বড় সভা হবে বুঝি ?"

"তা হবে বৈকি !—আমাকে কিন্তু আজকেই বেরুতে হচ্ছে; পাঁচটার ট্রেনটা ধরতে পারলে বড্ড ভাল হয়।"

"তা বেশ ত, চলুন না, আপনার জিনিষ পত্তর সব গোছগাছ করে দিচ্ছি—ভারি তো হাঙ্গাম!" বলিয়া সুভা বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা প্রায় চারটের সময় একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ মাত্র হাতে করিয়া বিমল ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল। যাইবার সময় সুভা গলায় কাপড় দিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিমল বলিল, "তোমার জন্যে আসবার সময় কি নিয়ে আসবো বল দেখি সুভা?" তারপর হঠাৎ নিজেই বলিয়া উঠিল, "এক জোড়া ছাপা-পাড় খদ্দর নিয়ে আসবো কি বল?"

"আচ্ছা" বলিয়া সুভা একটা বালির টিন তার হাতে দিয়া বলিল,—"এর ভেতর পান রইলো বিমল-দা, গাড়ীতে খেতে খেতে যেও!"

"ওরে বাবা, এত পান কে খাবে?—মোটে ত দুঘণ্টার রাস্তা আমি রাক্ষস নাকি," বলিয়া বিমল বালির টিনটা আপনার খদ্দরের ঝুল পাঞ্জাবীটার ফাঁদালো পকেটের মধ্যে জোর করিয়া ঠাসিয়া পুরিয়া দিল এবং তারপর একবার মাত্র সুভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে এখন আসি সুভা!"

বিমল বাহির হইয়া গেলে পর, বাহিরের ঘরের জানালাটার ধারে আসিয়া সুভা নীরবে দাঁড়াইল। পথটা সোজা ভাবে ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই বিমলকে অনেক দূর পর্য্যন্ত

দেখা যাইতেছিল, ক্রমে যখন তাকে আর দেখা গেল না, তখন জানালাটাকে বন্ধ করিয়া দিয়া স্বভা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "এখনো যে বড় উনুনে আগুন দাও নি বৌদি?"

"হঠাৎ সংসারে এত মন যে?" বলিয়া কিরণ একটু হাসিতেই সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, সংসারে আমার কবে মন ছিল না শুনি?"

১৩

আজ তিন দিন হইল বিমল চলিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া আপনার শোবার ঘরের মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া স্বভা একটা নভেলে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর সে হঠাৎ বইখানাকে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের নীলাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মনটা আজ তার কিছুতেই যেন সুস্থির হইতেছে না—কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না। বাহিরে যতদূর দৃষ্টি যায়

দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ নীলাকাশ টাটা করিতেছে—কোথাও একটুকরা মেঘের চিহ্নমাত্র নাই ; কেবল অনেক উঁচুতে, দুএকটা চিল শূন্যে উধাও হইয়া লি-লি করিতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া সুভা তাকের উপর হইতে দোয়াত কলম পাড়িয়া, বিমলকে চিঠি লিখিতে বসিল।

অনেকবার কাটিয়া ছাটিয়া, অবশেষে অতিকষ্টে চিঠি লেখা শেষ করিয়া, সুভা পত্রখানা একবার আদ্যোপান্ত পড়িল। তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন চন্ চন্ করিয়া উঠিল—সে এ কি লিখিয়াছে ?—এ যে একেবারে নেগাতই—ঘৃণায় লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর একবারে চিন্ চিন্ করিয়া উঠিতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে, সেই ব্রাহ্ম মেয়েটার চিঠি পড়িয়া সে মনে মনে তাকে কতই না ঘৃণা করিয়াছে, আর আজ ?—তবুও সেত অবিবাহিতা, আর সে ?—নিজের উপব সুভার ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ একি চিঠি লিখিয়াছে সে ? সেই ব্রাহ্ম মেয়েটার চিঠি যে এর চেয়ে ঢের সংযত ! অত্যন্ত বিরক্তভাবে সে চিঠিখানাকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানলা গলাইয়া পাশের পোড়ো জমিতে ফেলিয়া দিল ; হঠাৎ একটা *দমকাবাতাসে চিঠির গোটাকতক ছেঁড়া টুকরা, জানলা গলিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া সেগুলোকে খুঁটিয়া লইয়া, মুঠার

মধ্যে অত্যন্ত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, একটা তাল পাকাইয়া, অত্যন্ত জোরে জানলার ভিতর দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তারপর বিছানার উপর আসিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

নিজের উপর তার আজ ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। আজ অনেক দিন পর সুভার স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গেল। বেচারা জীর্ণশীর্ণ, অনাদৃত, অবজ্ঞাত স্বামী তার!—সুভার কান্না আসিতে লাগিল; হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া সে ডাকিল, "ঝি!"

রান্নাঘর ধুইতে ধুইতে ঝি উত্তর দিল, "কি গা দিদিমণি?"

"একবার আমার নাম করে মাসীমাদের বাড়ী গিয়ে শরতকে ডেকে আনতে পারিস?—বলবি, বড্ড দরকার আছে, বুঝলি!—এখুনি চলে যা, দেরী করিস নে।" বলিয়া সুভা আবার বিছানার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল। সে একি করিতে বসিয়াছে? তবে কি সে—? সুভার দম্ ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কিরণশশি আসিয়া ডাকিল, "আজ আর তেঁতুল ছাড়াবে না ঠাকুরঝি?"

বালিস হইতে মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "না!"

অস্পষ্টস্বরে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে কিরণ

চলিয়া গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া সুভা উঠিয়া বসিল এবং অত্যন্ত অস্থিরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল!

হঠাৎ এক সময় শরৎ আসিয়া দরজার কাছ হইতে ডাকিল, "সুভাদি!"

"কে শরৎ?—এস দাদা এস!—কদিন এসনি কেন ভাই?" .বলিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে সুভা তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তার চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া শরৎ বলিল, "আমি ত এখানে কদিন ছিলুম না সুভাদি।"

"কেন, কোথায় গেছলে শরৎ?"

মাটির দিকে চাহিয়া শরৎ বলিল, "কলকাতায়।"

"কলকতায়?—তা এদের খবর টবর কিছু—"

কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়াই অত্যন্ত বিরক্তভাবে শরৎ বলিয়া উঠিল, "না, বিমলদার খবর আমি—।"

বাধা দিয়া সুভা বলিয়া উঠিল, "বিমলদার কথা আমি বলছিনা ভাই, আমি বলছি—।"

"ওঃ লালুদার কথা?—সে খোঁজে তোমার দরকার কি সুভাদি?"—শরৎ আরও কি বলিতেছিল—সুভার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

রুদ্ধ অশ্রুর বেগ প্রাণপণ বলে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, সুভা ডাকিল, "শরৎ!" সে স্বর অত্যন্ত কঠোর।

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে শরৎ উত্তর দিল, "কি?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সুভা বলিল, "না কিছু না— তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও।" এবং পরক্ষণেই কি মনে করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "না, না, যেওনা, একটু দাঁড়াও!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার একটা উপকার করতে পারবে শরৎ?"

"কি বল?"

"একবার কলকাতায় যেতে পারবে?"—সুভার কণ্ঠ বাধিয়া বাধিয়া যাইতেছিল।

হঠাৎ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে শরৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না সুভাদি, তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে মাপ করো!"—তার স্বর অশ্রুরুদ্ধ।

সুভা এবার কাঁদিয়া ফেলিল, "তোমার ওপর একটুও রাগ করিনি শরৎ—তুমি যে আমার কি উপকার করলে, সে আর,—" এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চোখ মুছিয়া সুভা বলিল, "একটু দাঁড়াও!"—সে স্বর দৃঢ় এবং গম্ভীর। কথাটা শেষ করিয়াই সে কালিকলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। বিবাহের পর স্বামীর নিকট তার এই প্রথম পত্র। সে কতবার

লিখিল, কতবার ছিঁড়িল, চোখের জলে কতবার চিঠি নষ্ট হইয়া গেল ; শেষকালে অনেক কষ্টে চিঠি লেখা শেষ করিয়া, মুড়িয়া শরতের হাতে দিয়া, সে বলিল, "এইটে তার হাতে দিয়ে আসতে পার শরৎ ?"

"পারি !" বলিয়া শরৎ তার সেই অদ্ভুত মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

"আজকেই, এখুনি যেতে হবে কিন্তু—একটুও দেরী কোরো না শরৎ।"

"আচ্ছা।" বলিয়া শরৎ চলিয়া যাইতেছিল সে ডাকিয়া বলিল, "ওটা কিন্তু তুমি পোড়ো না শরৎ," তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, তুমি পড়তে পারো—কিচ্ছু বাধা নেই।"

শরৎ চলিয়া গেলে পর সুভা আবার বিছানার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং কচি মেয়ের মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৪

রাত তখন প্রায় নটা কি দশটা হইবে, খালের ধারে লালু চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। সমস্ত দিন গুমটের পর এই কিছুক্ষণ হইল একটু একটু হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ণিমার রাত্রি, মাথার উপরকার নীল আকাশটা জ্যোছনায় একেবারে ফট্‌ ফট্‌ করিতেছে এবং খালের ধারের বড় বড় অশ্বথ গাছ-গুলোর অন্তরালে গোটাকতক কাক ভোর হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া মাঝে মাঝে কা-কা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেছিল। দূরে একটা বিবাহ বাড়ী হইতে সানাইয়ের করুণ সুর ঝির্‌ঝিরে-বাতাসে মিহি হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসিয়া আসিতে ছিল। কে জানে কেন, লালুর আজ নিজের বিবাহ-রাত্রের কথা মনে-পড়িয়া গেল। আট বছরের বালিকা-বধূর সেই কচি মুখখানি হঠাৎ আজ তার চোখের সামনে সত্যকারটির মত হইয়া ভাসিয়া উঠিল। সে যেন জাগিয়া জাগিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছে! হঠাৎ এক সময় তার মনে হইল, এ কি করিতেছে সে? সে পাগল হইল নাকি! তার পরই কেমন যেন তার ভয় হইতে লাগিল। আজ কিছুদিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে তার মনটা কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নাই এবং তার মনটা রাতদিন এমন সব কথা ভাবিতে থাকে, যাহার

সহিত তার বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকা স্বাভাবিক নয়; সে যেন অতি বড় অনাসৃষ্টি একটা কিছু করিতে বসিয়াছে, এমনি ধারাটা তার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু আজকের এই রাতটা তার বেশ লাগিতেছে, এত ভাল করিয়া সে এই দুনিয়াটার দিকে কোন দিন চাহিয়া দেখে নাই। খালের জলেব দিকে চাহিয়া লালু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খালের বুকের উপর একরাশ জ্যোছনা চিক্ চিক্ করিতেছিল—লালু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় কি মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। খালের ধারের মেটে পথটা দিয়া একটি তরুণ যুবক পাতলা ফিন্‌ফিনে একটা আদ্দির পাঞ্জাবী উড়াইয়া, ছড়ি ঘোরাইতে ঘোরাইতে তার সুমুখ দিয়া চলিয়া গেল; লালু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকটি যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ লালু একবার নিজের ছেঁড়া এবং মলিন ধুতিটার দিকে চাহিল, তার মনটা কেমন যেন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। একটা ফর্সা কাপড় অন্ততঃ তার চাই-ই চাই, এ কাপড় পরিয়া আর থাকা যায় না—ওঃ কি ভয়ানক ময়লা! চিমটি কাটিলে বোধ হয় ময়লা উঠিয়া আসে। লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ কি

মনে করিয়া খালের ধারের রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাত তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে—সহরের পথঘাট সব একবারে জনমানব শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। লালু কিছুদূর চলিয়া আসিয়া, হঠাৎ একটা বহুকালের পুরাতন ইঁট বারকরা দোতালা বাড়ীর সামনে আসিয়া, দাঁড়াইল। বাড়ীটার পাশ দিয়া একটা অত্যন্ত সরু আবর্জ্জনাপূর্ণ মেথর খাটা অন্ধকার গলি—ভিতর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সে এদিক ওদিক চাহিয়া গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং কিছুদূর চলিয়া আসিয়াই সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার পিছন দিকের দেয়ালের গায়ে একটা আধভেজান জানালা দেখিতে পাইয়া, অত্যন্ত সন্তর্পণে আস্তে আস্তে রেলিং ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। ভিতরের দিকে উঁকি মারিয়া লালু দেখিল, একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে মিট্ মিট করিয়া একটা মেটে প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং মেঝের উপর একটা আধ ময়লা বিছানার উপর একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের তরুণী বধূ তার ঘুমন্ত স্বামীর হাতের উপর ছোট্ট মাথাটি রাখিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কি জানি কেন, লালুর হঠাৎ কান্না আসিতে লাগিল; সে জানালার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে গলিটা পার হইয়া আবার খালের ধারে আসিয়া বসিয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া

হঠাৎ এক সময় কি মনে করিয়া, ঘাসের উপর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

সেই অনেক বৎসর আগেকার বালিকা সুভার কাঁচ মুখখানির কথা, আজ লালুর বার বার করিয়া মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। —সেই সুন্দর, করুণ মুখখানি!—লালুর কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু একি?—সে পাগল হইল নাকি!—তার মনে হইতে লাগিল, সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটায় তার বিপক্ষে মস্তবড় একটা ষড়যন্ত্র অনবরত পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে,—না না, এমন করিয়া সে আর বাজে স্বপ্ন দেখিবে না। যাহা হইবার নয় এবং যাহা তার পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক, তাহা লইয়া এমন করিয়া বার বার নাচিয়া ওঠাটা আদবেই নিরাপদ নয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঠিক এমনি একটা মন লইয়া সে একটা ভাঙ্গা খোলার-ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিল, সেই কালো কুৎসিত মেয়েটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; ঠিক এমনি করিয়াই জগতটা তার চোখের সামনে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তারপর?—লালুর কান্না আসিতে লাগিল, টিকিবে না—টিকিবে না!—তার মত জন্ম-হাবাতের কপালে এ সব জিনিষ টেকে না—টেকা স্বাভাবিক নয়!—বেশ আছে সে, দিব্য নিশ্চিন্ত আছে সে, কেন মিথ্যে এ সব ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে যাওয়া?—না, না!—সে এসব চিন্তা মন হইতে একবারে টানিয়া ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে,

এমন করিয়া মনের মাঝখানে আগাছা জন্মাইতে দেওয়া হইবে না, কখনই না—কিছুতেই না!—কিন্তু কান্না আসে যে?—একটু আধটু নয়, একবারে বুকফাটা কান্না! লালু ছোট ছেলের মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা প্রায় দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ কচলাইয়া উঠিয়া বসিয়া লালু দেখে, চারিদিকে রৌদ্র একবারে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে এবং সে ঘামে একবারে নাহিয়া উঠিয়াছে। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই সে একবার দুনিয়াটার দিকে চাহিল। দূরের সেই বিবাহ বাড়ীটা হইতে আসোয়ারীর বুকভাঙ্গা অবসাদমাখা করুণ সুর বাতাসে ক্ষীণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছিল,—সে যেন কেবলি কান্না আর কান্না, লালুর বুকখানা খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতে লাগিল।

দুনিয়াটা আজ বেজায় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে!—বড্ড ফাঁকা, একবারে মরুভূমির মত ফাঁকা!— চারিদিকে রৌদ্র টাটা করিতেছিল, লালুর প্রাণটাও আজ তারি সঙ্গে টাটা করিয়া উঠিতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এই ভাবে বসিয়াছিল তা সে নিজেই টের পায় নাই, হঠাৎ এক সময় পিছন দিক হইতে কে তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত দিয়া ডাকিল, "লালু-দা!"

চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়াই অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে লালু বলিয়া উঠিল, "কেও শরৎ—কি মনে করে রে?"

লালুর হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া শরৎ বলিল, "সুভাদি তোমাকে চিঠি দিয়েছে লালু-দা।"

লালুর মনে হইতে লাগিল, সে নিশ্চয়ই জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে, কে জানে কেন, তার ভয়ানক ভয় হইতে লাগিল,—এ আবার কি?—কম্পিতকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ, তোমাকে।"

"কেন?"

"তা জানি না।"

লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আজ সৃষ্টির মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা কিছু গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে—লালুর ভয়ানক ভয় হইতে লাগিল—এসব তার কপালে টেঁকে না—টেঁকে না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া—শরৎ বলিয়া উঠিল, "চিঠিটা পড়বে না, লালু-দা?"

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে লালু বলিয়া উঠিল, "চিঠি?—হ্যাঁ, পড়ব।" তার পরেই হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই এখন এখান থেকে যা শরৎ—আমাকে একটু একলা থাকতে দে।" তার কথা বাধিয়া যাইতেছিল।

"জবাব দেবে না ?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া লইয়া ভাঙ্গা গলায় লালু বলিল, "তা জানি না, তুই কিন্তু এখন এখান থেকে চলে যা—তোর পায়ে পড়ি শরৎ—তুই যা !"

শরৎ চলিয়া গেলে পর লালু খালের ধারে উপুড় হইয়া পড়িয়া খানিকক্ষণ ছোট ছেলের মত করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিল, তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া চিঠিটা পড়িতে লাগিল ,—

"তোমাকে কোন দিন বিরক্ত করিনি, মনে করেছিলুম হয়ত কোন দিন বিরক্ত করবও না—কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে করতে হোলো,—তুমি ঘরে ফিরে এস—আমি হয়ত আর নিজেকে সামলাতে পারছি না—হয়ত খারাপ হয়ে যাচ্ছি—হয়ত"

লালু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—দুনিয়াটা তার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—একি !—তার কান্না আসিতে লাগিল। সে আবার ঘাসের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া খানিক কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, এক সময় সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। সে বার বার মনে মনে আওড়াইতে লাগিল, "সুভা খারাপ হয়ে যাচ্ছে !" এ কথাটায় কোনও একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ সে মনে মনে খুঁজিয়া পাইল না ; এই খারাপ হইয়া যাওয়াটা যে ঠিক কি পদার্থ তাহাও সে ভাল করিয়া

ঝিতে পারিল না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করিল না, কেবল একটা করুণ সুরের মত এই কথাটা তার মনের মধ্যে বার বার বাজিয়া উঠিতে লাগিল,—"সুভা খারাপ হয়ে গেছে—সে আর নিজেকে সামলাতে পারছে না।" লালু কিছুই ঠিক করিয়া বুঝিল না—কিন্তু তথাপি কে জানে কেন, তার কান্না পাইতে লাগিল। দূরে ঐ বিবাহ বাড়ীটার সানাইয়ের আওয়াজের মতই করুণ সুর তার বুকের মাঝখানে কেবল বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল—সে সুর বড় করুণ—কেবল কান্না আর কান্না!

হঠাৎ কি মনে করিয়া লালু উঠিয়া দাঁড়াইল। ও বাড়ীর ধারের [illegible] আনিতে নিজের [illegible], আজ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

লালু [illegible] বলল, "আমাকে খেউরি করে দে [illegible]"

খেউরি হইয়া লালু আবার সেই নাপিতের দোকানের [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল, [illegible], কতকাল তার মাথায় তেল পড়ে নাই—চুলগুলো সব একবারে জটা হইয়া গিয়াছে,—আর মুখখানা?—উঃ, কে যেন একরাশ জলন্ত কয়লা এইমাত্র তার মুখের উপর ছিটাইয়া দিয়া গিয়াছে।

পাশের একটা মুদির দোকানের ভিতর ঢুকিয়া লালু বলিল, "আধ পয়সার সরষের তেল দেবে গা!"

মুদী লালুকে বিলক্ষণ চিনিত, সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর আজ ব্যাপারখানা কি বল্‌ত রে?—খেউবি টেউরি হয়ে একেবারে হঠাৎ লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠলি যে দেখছি!"

অত্যন্ত করুণকণ্ঠে লালু বলিল, "আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি খুড়ো!" তার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

বেশ করিয়া তেল মাখিয়া লালু খালে গিয়া একটা ডুব দিয়া আসিল। আজ ঠিক্ একটি বৎসর পর সে নাহিতেছে। চান করিয়া উঠিয়া সেই পানের দোকানটার সুমুখে আসিয়া সে আর একবার দাঁড়াইল,—তবু যেন একটু মানুষের মত তাকে দেখাইতেছে। কে জানে কেন, লালুর হঠাৎ কান্না আসিতে লাগিল।

পানের দোকানের সাম্‌নে ভিজা কাপড়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লালু হঠাৎ কি মনে করিয়া, তার সেই চিরপরিচিত সুঁড়িখানাটার দিকে ছুটিতে লাগিল।

বড় বাবু তাঁর সেই চিরাভ্যস্ত লম্বা টেবিলটার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে ভিজা কাপড়ে আসিয়া লালু বলিল, "আমাকে একটা শুকনো কাপড় আর একটা টাকা দেবেন বড়বাবু?—দু'চার দিনের ভিতরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে বড়বাবু বলিল, "কেন, কি হবে শুনি?"

"আমি বাড়ী যাচ্ছি বড়বাবু—আমার কাছে তো রেল ভাড়া নেই—তাই—"।

সাগ্রহে বড়বাবু বলিয়া উঠিল, "তা বেশ ত, এখুনি টাকা বার করে দিচ্ছি—কিন্তু যা শিখিয়ে দিয়েছি তা যেন মনে থাকে, দু'চার দিন বেশ লক্ষ্মী ছেলেটীর মতন চুপ্ চাপ্ থাকবি তার পরই হঠাৎ একদিন বুঝলি কি না—"।

বড়বাবুর দেওয়া শুকনো ফর্সা কাপড়টি পরিয়া, সুভার চিঠিটী অত্যন্ত যত্নসহকারে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইয়া, লালু শিয়ালদা ষ্টেশনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

আকাশটা একটু একটু মেঘলা করিয়া আসিতেছিল; ঠাণ্ডা একটা ঝিরঝিরে বাদলা হাওয়া খালের ধারের বড় বড় অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলোকে শির শির করিয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। লালুর হঠাৎ আজ গান গাহিতে ইচ্ছা হইল; ছেলেবেলায় সে একবার বারোয়ারি তলার যাত্রায় শ্রীমন্তের মশান দেখিয়াছিল, তাহারি একটা গান আপনার মনে গুণ গুণ করিয়া গাঁহিতে গাহিতে সে চলিতে লাগিল।

শিয়ালদা ষ্টেশনে আসিয়া আট আনা খরচ করিয়া থার্ডক্লাসের একটা টিকিট কিনিয়া লালু গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। প্রায় ১৫ মিনিট পর গাড়ী ছাড়িল। কত মাঠ, ঘাট, জঙ্গল, গ্রাম, খাল, বিল, পার হইয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল, জানালার ধারে বসিয়া লালু এই সব দেখিতে লাগিল। এমনি করিয়া তার

মনটাও ছুটিতেছে আজ কিসের টানে তা কে জানে। ঠিক এমনি করিয়াই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে সে কত কি।

প্রায় সন্ধ্যার সময় গাড়ী আসিয়া লালুদের গ্রামে ধরিল। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া, ষ্টেশন পার হইয়া, সরু আঁকা বাঁকা যে পথটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে গাঁয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইটাকে ধরিয়া লালু বরাবর উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—শুক্লপক্ষের রজনী, পথ ঘাট সব একেবারে আলোয় ফট্‌ফট্‌ করিতেছে। দূরে একটা লোক আসিতেছে না—যদি সে চেনা মুখ হয়, তা হলেই সর্ব্বনাশ! একগাদা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলিয়া তাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিবে তারপর সেই একঘেয়ে ছি ছি, আর [illegible]।

ছেলেবেলা হইতেই সে দাদা [illegible] লোকদের কাছ হইতে ইহার ছি ছি আর নাহক 'আহা উহু' শুনিয়া শুনিয়া হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যে উপদেশ কিম্বা সহানুভূতি তার আর ভাল লাগে না।

লোকটা আর একটু আগাইয়া আসতেই লালু তাড়াতাড়ি পথের ধারের একটা ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তারপর লোকটা তাকে ছাড়াইয়া, ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল দেখিয়া, সে বাঁশঝাড়ের আড়াল হইতে বাহির হইয়া, আবার গ্রামের দিকে চলিতে সুরু করিয়া দিল। আর একটা

মোড়' বাঁকিলেই সে সুভাদের গ্রামে 'আসিয়া' পড়িবে—কিন্তু তারপর?—তারপর কি আর!—তারপর সে সুভাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিবে। তারপর সুভার সহিত দেখা হইবে, সেও কাঁদিবে—সুভাও কাঁদিবে। কিন্তু সুভা যদি না কাঁদে—সে যদি,—লালুর বুকটা হঠাৎ ছ্যাং করিয়া উঠিল।

সেই মোড়টা কখন সে পার হইয়া আসিয়াছিল—খেয়াল করিতে পারে নাই। দূরে একটা একতালা কোঠা বাড়ীর একটা ছোট জানালার ভিতর দিয়া যে ক্ষীণ একটি আলোকরেখা বাহির হইতেছিল, তাহারি দিকে চাহিয়া লালু হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তার চোখদুটা সহসা জ্বালা করিয়া উঠিল। আর একটু—আর একটু!—তার পরই!—লালুর বুকের ভিতরটা দুর দুর করিতে লাগিল।

গভীর অন্ধকার রাত্রে, কত বাড়ীতে সে চুরি করিতে গিয়াছে, তার বুকটা সময় সময় কাঁপিয়া উঠে নাই যে, তাহা নয়—কিন্তু এত জোরে জোরে না। নিজের স্ত্রীর কাছে যাইতেছে সে, চুরি করিতেও নয়—ডাকাতি করিতেও নয়। তবে এত ভয় কিসের!—তার পা দুটা হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল।

জোর করিয়া সে নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এই ত সে সুভাদের বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু তারপর?

দরজার ভিতর দিয়া বাহির উঠানের আধখানা দেখা যাইতে-

ছিল, সেখানে কেউ নাই। সাহসে ভর করিয়া লালু উঠানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। শূন্য উঠান—জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। হঠাৎ কি মনে করিয়া, লালু আবার বাহিরে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তার মনে পড়িয়া গেল, সে দেখা করিতে আসিয়াছে সুভার সহিত, কিন্তু তার পূর্ব্বে ত তাকে সুভার বাপের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে!—সে কি বলিবে? উঃ, আবার সেই ছি ছি আর আহা চু চু! সেই একঘেয়ে সনাতন সহানুভূতি আর হিতোপদেশ, সেই নাকে কান্না আর তিরস্কার!—ভাল লাগে না—ভাল লাগে না, ওসব আর!—সে চায় ভুলিতে—সব ভুলিতে; যাহা কিছু করিয়াছে সে এবং যাহা কিছু করে নাই সে—সবই সে ভুলিতে চায় আজ। অতীতকে অতীত বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া, তাকে শুধু কেবল বর্ত্তমানের ভিতব দিয়াই বুকে টানিয়া লইতে পারে, এমন একটি প্রাণীও কি দুনিয়ায় নাই! মাথার উপর শুক্লপক্ষের নিটোল সুন্দর চাঁদখানি নিস্তব্ধ এই পৃথিবীটার বুকের উপর তার স্নিগ্ধ করুণ হাস্যধারা ছড়াইয়া দিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া, লালুর মনে হইতে লাগিল—আছে,—আছে—নিশ্চয়ই আছে!

লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চোখ কান বুজিয়া একবার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেই সব গোল মিটিয়া যায়, কিন্তু পা যে অগ্রসর হইতে চায় না।

নাঃ, আজকের দিনটা থাক্। কাল সকালে উঠিয়া সে, যা

হয় কিছু একটা করিবে। কিন্তু কালও ত সেই একই বিপদ, সেই স্বভাবর বাপের সামনে দাঁড়াইয়া, একটা পাথরের মূর্ত্তির মত কেবল কথার পর কথা শুনিয়া যাওয়া—সেই একঘেয়ে কথা। তবে আজই কেন সেটাকে চুকাইয়া রাখুক না সে!—নাঃ, থাক্‌গে, আজকের রাত্তিরটা আর নয়—কাল যা হোক্ করিবে সে।

স্বভাদের বাড়ীর ঠিক পিছনেই একটা প্রকাণ্ড আমবাগান জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগের বাগান, কাজেই কেহই সেটার দিকে লক্ষ্য করিত না, সেটা একটা আবর্জ্জনার মত পড়িয়া ছিল। লালু ধীরে ধীরে সেই বাগানটার ভাঙ্গা পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে গিয়া পড়িল।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বভাদের বাড়ীর একটা ঘরের জানালার ভিতর দিয়া একটা ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া লালু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। শরীরটা তার বড্ডই দুর্ব্বল। আজ দুদিন সে নেশা করে নাই, শরীরটা বড্ডই ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে। একটা হাই তুলিয়া, গা মোড়া দিয়া, লালু ধীরে ধীরে গাছতলায় শুইয়া পড়িল। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তা সে নিজেই টের পায় নাই। হঠাৎ মধ্য-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

স্বভাদের বাড়ীর পিছন দিককার সেই জানালাটার ভিতর দিয়া তখন পর্য্যন্ত সেই ক্ষীণ আলোটা দেখা যাইতেছিল। লালু

আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া সেই জানালাটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জানালাটা মাটি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে বসান। অত্যন্ত সন্তর্পণে, নিজের দেহটাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা করিয়া লইয়া, লালু জানালাটার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। তার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। কি দেখিবে সে? —হয়ত এমন একটা কিছু দেখিবে, যা তার সমস্ত জীবনটাকে মাটি করিয়া দিবে,—হয়ত—হয়ত, সহসা স্বভাব সেই চিঠি-খানার কথা লালুর মনে পড়িয়া গেল,—"আমি নিজেকে আব সামলাতে পারছি না",—একথাটার অর্থ সে যেন এখন একটু একটু বুঝিতে পারিল। জানালার ভিতর দিয়া ঘরের দিকে চাহিতে লালুর সাহস হইল না,—সে লাফাইয়া পড়িয়া আবাব সেই গাছতলায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।—কিন্তু একি!—সে পাগল হইল না কি? ঐ খোলা জানালাটা তার চোখের সামনে কি দৃশ্য ধরিয়া দিবে তা কে জানে!—কিন্তু দিক সে যা দেবার, সে দেখিবেই, ঐ আলোটাব ভিতর দিয়া তার ভবিষ্যত জীবনের কতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

লালু আবাব উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আবাব সেই জানালাটার ধারে আসিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে রেলিং ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। একি!—লালুর দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। ঘরের এক ধারে ছোট্ট একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পালঙ্কের উপর, ধবধবে শুভ্র শয্যাটি খালি পড়িয়া রহিয়াছে, আর মেঝের উপর

নিজের ছোট্ট হাতখানির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে একটি মেয়ে—চুলগুলি তার আলু থালু, পরিধেয় বসনখানি এলো মেলো। লালু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিল। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল দুদিন আগেকার একটি রাত্রির কথা। কলিকাতা সহরের এমনি ছোট খাটো একটি বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া, জানলার উপর উঠিয়া সে দেখিয়াছিল একটি দৃশ্য, যেটা আজও তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে জানলার ভিতর দিয়া দেখিয়াছিল, একটি তের, চৌদ্দ বৎসর বয়সের মেয়ে তার স্বামীর হাতখানির উপর ছোট্ট মাথাটি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে,—কি নীরব একটি শান্তির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই মেয়েটির মুখ খানিতে। আর সুভা?—ওঃ, তার মুখ খানা? সে মুখ-খানি কেমন তা লালু দেখিতেই পায় নাই, কেন না, সে অন্য দিকে মুখ করিয়া ঘুমাইতেছিল; কিন্তু লালুর মনে হইতে লাগিল, সে মুখ অত্যন্ত করুণ—অত্যন্ত বিষাদময়। তার আরও মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া, এইমাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লালুর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, লোহার রেলিংগুলো ভাঙ্গিয়া এক লম্ফে ঘরের মধ্যে পড়িয়া সে প্রাণপণ বলে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই—কোন উপায় নাই!—কেন সে আজ সাহস করিয়া বাড়ীর

ভিতর গেল না—কেন সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অবহেলা করিয়া সে সাহস করিয়া গিয়া সুভার বাপের সামনে দাঁড়াইল না।—এখন ত আর উপায় নেই।—লালুর কান্না আসিতে লাগিল, আবার ২৬টা ঘণ্টা তাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কাল রাত পর্য্যন্ত এই এত বড় একটা তৃষ্ণাকে তার বুকের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। সেই গাছ-তলাটায় আসিয়া বসিয়া পড়িয়া লালু বার বার এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল। সে ঘুমাইতে পারিল না, ঘুমাইবার প্রবৃত্তিও তার ছিল না।

* * * * *

সবে মাত্র ভোর হইয়াছে। দাওয়ার উপর বসিয়া সুভার বাপ হরিশঙ্কর তামাক টানিতে টানিতে সংসারেব হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন, হঠাৎ কে আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবাক হইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া হরি-শঙ্কর কি একটা কথা বলিতে গিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "ওকি, তুমি কাঁদছ না কি!—কি হয়েছে তোমাব?

সেই সবে মাত্র জাগিয়া উঠিয়া সুভা রান্নাঘবে বসিয়া উনানে আগুন দেবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কিরণশশি ঝড়ের মত বকিয়া যাইতে লাগিল, "ঠাকুর জামাই এসেছে ঠাকুর-ঝি—মাইরি বলছি—তোর পা ছুঁয়ে বলছি—না বিশ্বাস হয়, তুই নিজে এসে দেখে যা।"

সুভা কোন উত্তর দিল না, কেবল মাথাটাকে আরো হেঁট করিয়া উনানের দিকে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে, তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মাধুরী বলিল, "ওকি !—তুই কাঁদছিস্ কেন ঠাকুর-ঝি ?"

সেই দিনই দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া, বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া লালু ভাবিতেছিল, আর কটা ঘন্টা,—তারপরই সে সুভাকে গিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবে যে, সে আর কখন খারাপ হইবে না—চিরকাল লক্ষ্মী ছেলেটির মত তার চোখে চোখে থাকিবে, তাকে ভাল বাসিবে, আদর করিবে, বুকের ভিতর করিয়া লইয়া রাত্রে শুইবে,—আর কখন ছাড়িয়া যাইবে না। এ কথা শুনিয়া সুভা কত না খুসী হইবে ! হয়ত তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কত না কাঁদিবে, তার চোখের জলে লালুর বুকখানা একবারে ভাসিয়া যাইবে ; তারপর সেও কাঁদিবে, ফুলিয়া ফুলিয়া ছোট ছেলের মত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে সুভার বুকখানাকে একেবারে ভিজাইয়া দিবে। তারপর ?—তারপর, কি সুখের দিন হইবে তার ? লালু তার ভবিষ্যৎ জীবনটার একটা মোটামুটি ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমনি হইবে সে, তেমনি হইবে সে, কিন্তু থাকগে সে কথা !—আজকের চিন্তা আজ করা যাক্ ! আজ রাত্রে সে প্রথমে কি বলিয়া কথা কহিবে ?—কিছু না, কিছু না, সে প্রথমেই সুভাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপটি করিয়া থাকিবে—একটি কথাও বলিবে না —কি দরকার কথার? লালু জানলার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে একবার চাহিল, এখন যথেষ্ট বেলা রহিয়াছে। বড জোর এখন ত্নটা বাজিয়াছে—কি, তাও নয়। এখনও এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ঘণ্টা!—দশটার আগে কি আর খাওয়া দাওয়া চুকিবে? কিন্তু এখনও যে অনেক দেরী!—লালুর অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ঘুমাইযা পড়িলে মন্দ হয় না, বেশ হঠাৎ এক সময় জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিবে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তারপর খাওযা দাওয়া করিতে করিতেই নটা বাজিয়া যাইবে—তার পর—।

হঠাৎ তার চিন্তার ধারাটাকে মধ্য পথে বাধা দিযা বাহিব হইতে কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, "এইটেই কি হরিশঙ্কব গাঙ্গুলীর বাড়ী?"

পাশের ঘরে একটা মাত্নরেব উপর শুইয়া হরিশঙ্কর একটু ঝিমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন,— জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমাবি নাম হরিশঙ্কর গাঙ্গুলী, আপনারা কি চান এখানে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "এখানে লাল বেহারী বলে কেউ এসেছে বলতে পারেন?"

লালুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধড়াস করিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল,

তাহাতে তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত হঠাৎ একেবারে চিন্‌ চিন্‌ করিয়া উঠিল। একি!—সে স্বপ্ন দেখিতেছে না ত! পুলিস্‌?—পুলিস এখানে কেন? সে ত আজ কালের মধ্যে কোথাও কিছু করে নাই—তবে একি।"

তার পরই কি গণ্ডগোল! পাড়ার যত লোক আসিয়া জুটিল। কেহ হাসিল, কেহ আহা বলিল, কেহ দুঃখ করিল, কেহ টিটকারি দিল। লালু চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিল, তার সর্ব্বশরীরের রক্ত হিমের মত শীতল এবং নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কে একজন আসিয়া ডাকিল, "ওহে বাবু, উঠে পড় দেখি।" কি ভয়ানক কর্কশ তার কণ্ঠ!—"ওঠ না হে, মটকা মেরে পড়ে থাকলে আর কি হবে!—ওঠ ওঠ।"

লালু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তার মাথা টলিতেছিল—দুনিয়াটা যেন চারিদিকে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে।

চারিদিকে অনেক লোকে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। পাড়ার কেহ আর বাকি নেই। ছেলে বুড়া, ভদ্রলোক, ছোটলোক, সব আসিয়া জুটিয়াছে।

লালু করুণভাবে একবার চারিদিকে চাহিল, তার পর ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত ম্লানকণ্ঠে বলিল, "আমি ত কিছু করিনি মশাই।"

যে লোকটি তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে একজন বাঙ্গালী দারোগা।

একটা বিকট হাসি হাসিয়া সেই মোটা লোকটা বলিয়া উঠিল, "না তুমি একবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আর কি।" তার পরই হঠাৎ খুব জোরে একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "সত্য সুঁড়ীর কাছে এক গাছা সোণার হার কে বাঁধা দিয়েছিল শুনি?"

কম্পিতকণ্ঠে লালু বলিল, "আমি! কিন্তু সে অনেক দিন আগে।"

ঘরখানাকে হাসির চোটে প্রায় ফাটাইয়া তুলিয়া দারোগা চীৎকার করিয়া উঠিল, অনেক দিন আগেকার চুরি বুঝি আর চুরি নয়?—চুরি বিদ্যে না শিখে, ওকালতী শিখলে না কেন হে, তা হলে বেশ দুপয়সা—"। কথাটাকে শেষ না করিয়াই, হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ করিয়া, পা ঠুকিয়া লোকটা চিৎকার করিয়া উঠিল, "সে হার কোত্থেকে পেয়েছিলে বল শিগ্গির—মিছে কথা বোলো না,—খবরদার!"

অত্যন্ত ধীরে এবং অবিচলিত কণ্ঠে লালু বলিল, "চুরি করে এনেছিলুম।" তার পরই কি সে চিৎকার! চারিদিক হইতে কি সে ছি ছি বর্ষণ!

লালুর শ্বশুর হরিশঙ্কর আসিয়া বলিলেন, "ওকে এবারটা আপনারা—"।

ধমক দিয়া উঠিয়া দারোগা বলিল, "কেন বাজে বকেন মশাই!—ওর নামে warrant বেরিয়েছে, সে খবর রাখেন?—রামসিং হাত কড়াটা—!"

কাতব দৃষ্টিতে একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া লালু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আজ রাত্তিরটা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি সত্যি বলছি কোথাও পালাবো না।" এই অবধি বলিয়াই সে ছোট ছেলেব মত কবিয়া হাউ হাউ কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাবিদিকেব হৈ চৈ এর মধ্যে তাব সেই আকুল ক্রন্দন কোথায় মিলাইয়া গেল।

হো হো কবিয়া হাসিয়া উঠিয়া দারোগা চিৎকার করিযা উঠিল, "পাক্কা ওস্তাদ দেখছি—ওকে আজ বাত্তিরটিব জন্মে ছেড়ে দিই, তাবপব কাল উনি—"

অত্যন্ত দৃঢ এবং অবিচলিত কণ্ঠে লালু উত্তব দিল, "আমি শপথ কবছি—পালাবো না।" আবাব একটা হাসিব রোল চাবিদিক হইতে উঠিয়া বাতাসে মিলাইযা গেল। বামসিং আসিয়া লালুব হাতে হাতকড়া পবাইয়া দিল।

লালু আব কোন কথা বলিল না। একটি বাত্রি—জীবনে একটি মাত্র রাত্রিব জন্য সে ভগবানেব কাছে আব্দার করিয়াছিল—শুধু একটি মাত্র বাত্রি।—তাব বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে ছিল, কিন্তু চীৎকাব কবিয়া কাঁদিতেও তাব আজ প্রবৃত্তি হইতে ছিল না। সে আজ কাহাবও কাছে দয়া ভিক্ষা করিবে না। কেন কিসেব জন্য?—না না, মানুষেব কাছে ত নয়ই—ভগবানেব কাছেও না। আজ বিশ্ব দুনিয়াটা তাব কাছে শুধু কেবল একটা ছেলেখেলা, একটা খামখেয়াল, একটা

স্বেচ্ছাচার বলিয়া মনে হইতেছিল। কিছু না, কিছু না—শুধু কেবল টিটকারি আর টিটকারি! পৃথিবীর বুক হইতেও টিটকারী—আকাশের বুক হইতেও তাই। সবই সমান, সবই,—কিন্তু একি! হঠাৎ সেই ঘরের জনতা ভেদ করিয়া লালুর পায়ের উপর আসিয়া পড়িল একটি রমণী মূর্তি—শান্ত, ধীর, অবিচলিত।

হরিশঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে আছিস্ রে, ধর্, মেয়েটা পাগল হোলো নাকি।"

লালুর পায়ের উপর হইতে মাথা না তুলিয়াই সুভা বলিল, "যাবার সময় আমাকে আশীর্বাদ করে যাও তুমি—যেন সুখী হতে পারি।" সে স্বর অত্যন্ত গম্ভীর এবং করুণ।

[illegible]

সমর্পণে সুভার মাথায় ঠেকাইয়া, শান্ত, ধীর, অবিচলিতস্বরে লালু বলিল, 'তোমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি সুভা—তুমি সুখী হও।' সে স্বর এত গম্ভীর এবং প্রশান্ত যে, ঘরখানা শুদ্ধ গম গম করিয়া উঠিল। কেউ একটি কথাও বলিতে পারিল না।

সমাপ্ত।